অন্বেষণ

কালিনগর মহাবিদ্যালয়
বাংলা বিভাগের নিজস্ব পত্রিকা

অন্বেষণ

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংস্করণ

সম্পাদক ঃ ডঃ ঈশিতা খাঁ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক ঃ প্রদীপ সরদার

সহ সম্পাদকমণ্ডলী ঃ ডঃ সুভাশিষ চট্টোপাধ্যায়, অনিমেষ মণ্ডল, নজ(ল ইসলাম, মুন্না মিস্ত্রী, সুদীপ্তা দাস, পূজা গিরি

প্রকাশক ঃ ডঃ ঈশানী ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত অধ্য(া, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

কপিরাইট ঃ @ কালিনগর মহাবিদ্যালয়

প্রচ্ছদ ঃ প্রিন্ট দ্যুতি

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ প্রিন্ট-অল, বসিরহাট

তারিখ ঃ ১০ ই জুন, ২০২৩

শুভেচ্ছাবার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগ প্রথমবার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নিয়ে একটি বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছে। আমি এই উদ্যোগের জন্য বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, যারা লিখেছো সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাই। আশাকরি এই পত্রিকা কলেজের বিদ্যায়তনিক সাফল্যের পথে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মেলবন্ধনে এই পত্রিকার আগামীদিনে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই কামনা করি।

সকলে ভালো থেকো

Ishani Ghosh
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'সবুজের অভিযান' কবিতায় ত(ণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন —

'' চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।'' —

আর এই জীর্ণ জরাকে ঝরিয়ে অফুরান প্রাণশক্তি(ছড়িয়ে দিতে ত(ণ প্রজন্মের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে কলম। একথা আমাদের মেনে নিতে বাধা নেই যে, ছাত্ররাই সমাজের সর্বাপে(া বলিষ্ঠ, সতেজ ও সবুজ অংশ। তাদের লেখনীশক্তি(' অগ্নিবীণা' ও 'গান্ডীবে' পরিণত হয়ে সমাজকে সংস্কৃতিকে দেখাতে পারে নতুন পথের দিশা। এই আশা নিয়েই কালিনগর মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ খুঁজে নিতে মরিয়া সেই তা(ণ্যের সমাহারকে। যাদের অন্তরে থাকবে 'বিষের বাঁশি' কণ্ঠে থাকবে 'শিকল ভাঙার গান', আর অন্তরে থাকবে সর্বহারা নিঃস্ব মানুষের মুক্তি(র জন্য ব্যাকুলতা, অবহেলিত - পদদলিত মনুষ্যত্ববোধে যাদের উপস্থিতি হবে নির্ভীক, রক্ত(পিচ্ছিল পথে যাত্রায় যারা হবে অকুতোভয়, সমস্ত গরল পান করে যারা হবে নীলকণ্ঠ। আমাদের এই সন্ধানের প্রয়াসই 'অন্বেষণ'। অন্বেষণের এটি প্রথম সংখ্যা। এই সংখ্যায় এক ঝাঁক ছাত্রছাত্রীর কলমের ডগায় উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি-সমাজ দেশ-কাল সম্পর্কিত নতুন বোধ ও ভাবনা। সকলেরই এটা লেখার প্রথম প্রয়াস, কিন্তু প্রত্যেকটি লেখনী আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। আজকের ত(ণ প্রজন্ম যখন ভোগের ভ্রান্তিবিলাসে, উন্মার্গগামিতার চোরাবালিতে, বিপথগামিতার উদ্‌ভ্রান্তিতে দিশেহারা, তখন বেতনী পারের কালিনগর দ্বীপস্থ ছাত্রছাত্রীদের দধীচি প্রতিম ভূমিকায় 'অন্বেষণ' যাতে তাদের পাশে থাকতে পারে এটাই হোক্ আমাদের পরম কামনা। 'অন্বেষণ' তার নবজন্মকালেই স্বর্ণপ্রসূ — এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সে দীর্ঘজীবী হোক। তার হাত ধরেই ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক —

'' আমরা সজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান।
সম্ভ্রমে নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।।''

'অন্বেষণে'র ল(্য শুধুমাত্র লেখককুল সৃষ্টি নয়, পাঠক সমাজের কাছেও সে তার চিহ্(রেখে যেতে উৎসাহী। তাই প্রথম প্রকাশের ভুল ত্রুটি মার্জনা করে বাধিত করবেন। আশা রাখি সহৃদয় পাঠকের শুভেচ্ছায় ও ভালোবাসায় ছাত্র সমাজের 'মস্তিষ্কের খেলাঘরে' সদ্যোজাত 'অন্বেষণে'র যাত্রাপথ হয়ে উঠবে সাফল্য মন্ডিত।

ডঃ ঈশিতা খাঁ

সূচীপত্র

* **বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান**
— স্নিগ্ধা পাল [2nd Sem. Bengali (H)]

* **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৮ খ্রিঃ)** — নন্দিতা বুনিয়া [2nd Sem. Bengali (H)]

* **রামনারায়ণ তর্করত্ন** — অনন্যা সাহা [2nd Sem. Bengali (H)]

* **চর্যাপদ** — বিউটি রায় [2nd Sem. Bengali (H)]

* **বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব** — বিভা মণ্ডল [2nd Sem. Bengali(H)]

* **'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার, প্রকাশ, নামকরণ, কবি পরিচয় এবং কাব্য পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করো ?**— পবিত্র মণ্ডল [2nd Sem. Bengali (H)]

* **বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব**
— মালবিকা সরদার [2nd Sem. Bengali (H)]

* **নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র** — অনুপম মান্না [2nd Sem. Bengali (H)]

* **মেঘনাদ চরিত্র** — দীপা মণ্ডল [2nd Sem. Bengali (H)]

* **আট বছর আগের একদিন কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুচেতনা**
— জয়শ্রী মণ্ডল [4th Sem. Bengali (H)]

* **সৃজনশীল সাহিত্য সমালোচনারীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য**
— মোনালিসা মণ্ডল [4th Sem. Bengali (H)]

* **ফুল্লকেতুর পালা ঃ নবনির্মাণে কালকেতু** — শর্মিষ্ঠা নাথ [4th Sem. Bengali (H)]

* **দেশ ভাগ ও বাংলা সাহিত্য** — সুদীপ্তা দাস [6th Sem. Bengali (H)]

* **পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আঞ্চলিকতা** — অমরেশ ধাড়া [6th Sem. Bengali (H)]

* **'চরিত্র সমাবেশে হে পূর্ণ তব চরণের কাছে'** — সুদেবী বি(োস [6th Sem. Bengali (H)]

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান

— স্নিগ্ধা পাল [2nd Sem. Bengali (H)]

মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের আসল নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ডাক নাম ছিল মাণিক। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস.সি. পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে 'অতসীমামী' গল্পটি রচনা করেন এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে সেটি প্রকাশ করেন। তখন থেকেই তিনি বঙ্গসাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে পরিচিত হন।

বঙ্গসাহিত্যে তখন চলেছে কল্লোলযুগ। এই 'কল্লোল পত্রিকা' কে কেন্দ্র করে শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ লেখকদের অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে তখন এক নতুন ভাবাদর্শের সন্ধান চলেছে। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শনের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের প্রসঙ্গে তখন চলেছে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের প্রভাব। বঙ্গসাহিত্যের প্রাঙ্গন তখন উত্তাল। নির্যাতিত নিপীড়িত কথা ও কাহিনী সাহিত্যে নতুন সুর এনে দিয়েছে। তাছাড়া মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকাল বি(াস করেছেন —

'' জীবনে জীবন যোগ করা —
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।''

তাই তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেননি। তাকে তিনি রোমান্টিকভাবে এবং ভঙ্গি সর্বস্ব কৃত্রিমতা বলে মনে করতেন। শৈলজানন্দ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন — '' তাঁর উপন্যাসে বাস্তব জীবনে আছে, কিন্তু বস্তির বাস্তবতা নেই। তাই মাণিকবাবু নিম্নশ্রেণির চাষাভুষা রচনায় ব্রতী হন। অর্থনৈতিক শোষন থেকে মুক্তি(র জন্য মার্কস নির্দেশিত শ্রমিক বিপ-বকে তিনি যথাযোগ্য সম্মান দেন। তাঁর সমসাময়িত উপন্যাসিক তারাশঙ্কর ছিলেন রাঢ় অঞ্চলের চিত্রকর তথা লেখক। কিন্তু মাণিক বন্দোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ববঙ্গের কথাশিল্পী। তাই তাঁর লেখনী বাংলা সাহিত্যে পেয়েছে নবমাত্রা।

'অতসীমামী' — ছোটোগল্পটি লিখে তাঁর সাহিত্যে জীবনযাত্রা শু(হয়েছিল। এরপর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৮টি উপন্যাস এবং ২৬৮টি ছোটোগল্প রচনাকর বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখা প্রধান প্রধান উপন্যাস ও ছোটোগল্প হল —

উপন্যাস ঃ- ১) দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫ খ্রিঃ), ২) পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৫ খ্রিঃ), ৩) জননী (১৯৩৫ খ্রিঃ), ৪) অহিংসা (১৯৪১ খ্রিঃ), ৫) পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৫ খ্রিঃ), ৬) শহরতলি (১৯৪০ খ্রিঃ), ৭) চতুষ্কোন, ৮) প্রতিবিম্ব (১৯৪৩ খ্রিঃ)।

ছোটোগল্প ঃ- অতসীমামী (১৯২৮ খ্রিঃ) প্রথম প্রকাশিত গল্প, ২) সরীসৃপ, ৩) প্রাগৈতিহাসিক, ৪) ভেজাল, ৫) মিহি ও মোটা, ৬) বৌ, ৭) হারানের নাতজামাই, ৮) পাশ ফেল, ৯) বিষাক্ত(প্রেম,

দিবারাত্রির কাব্য ঃ- প্রেমভিত্তিক নরনারীর জীবনের জটিল হৃদয় সম্পর্কের চিত্র। এটি ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও তত্ত্ব ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসের তিনটি ভাগ - প্রথম ভাগ 'দিনের কবিতা', দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা', তৃতীয় ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য'। প্রথম ভাগে হেমন্ত এসেছে সুপ্রিয়ার বাড়ি। সুপ্রিয়া হেমন্তকে ভালবাসত কিন্তু হেমন্ত তাতে সাড়া দেয়নি। সুপ্রিয়ার সঙ্গে পুলিশ অফিসার অশোকের বিয়ে হয় যাতে হেমন্তর ও প্রবল ইচ্ছা ছিল। হেমন্তর স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয়ভাগে হেমন্ত পুরীতে আসে, সেখানে আঠারে বছর পরে দেখা অনাথ আর মালতীর সঙ্গে। অনাথের সঙ্গে পালিয়ে

এসেছিল। এখন তাদের সম্পর্ক তীব্র ও জটিল। মালতী মন্দিরের পূজারিনী, অনাথ তাকে এড়িয়ে চলে, মালতীর মেয়ে আনন্দর বয়স তেরো। অনাথ - মালতীর নির্মম হৃদয়হীন সম্পর্ক আনন্দকে ক্লিষ্ট করে। সেও ভালোবাসতে চায়। আর নাচের মধ্যে তার স্বস্তি। অসুস্থ অশোককে নিয়ে সুপ্রিয়া পুরীতে আসে। হেমন্তর প্রতি সুপ্রিয়ার আকর্ষণ প্রবল ও সে আনন্দর প্রতি ঈর্ষাপরায়ন। অতঃপর তৃতীয় পর্ব। সেদিন মালতীর জন্মদিন কিন্তু তাকে উপে(া করে অনাথ চলে যায়। মালতী ও গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে যায়। হেমন্ত বিয়ে করবে আনন্দকে। হেমন্তর কথায় আনন্দ নাচে - পরীনৃত্য। ঘরের সব কাঠ জ্বালিয়ে আনন্দ নাচ শু(করে, নাচতে নাচতে আগুনে সে ঢলে পড়ে। তার আর প্রাণ নেই। এই বিচিত্র ভাব ও রীতির উপন্যাসে রোমান্টিকতার প্রকাশ পাওয়া যায় তা যেন জীবনকে এক মায়াময় দ্যুতিতে এক সংকেতিকতায় সমাচ্ছন্ন করে। নরনারীর জটিল মানসিকতার প্রকাশ ও হৃদয়ের বিচিত্র লীলা উপন্যাসে তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের সব চরিত্রই বিকারগ্রস্ত অসুখী। কেবল নিষ্পাপ আনন্দই সুন্দর। প্রেম তার কাছে পবিত্র স্বপ্ন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার জীবন পূর্ণতা লাভ করে। 'দিবারাত্রির কাব্য' সম্বন্ধে লেখক বলেছেন — 'দিবারাত্রির কাব্য' পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইটি খাপছাড়া অস্বাভাবিক, তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাস ও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়। সেই গুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection । মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির' কাব্যে মাণিক বন্দোপাধ্যায় - এর প্রতিভার স্বর্ণ সম্ভাবনার আভাসিত হয়েছে, আনন্দের চন্দ্রকলা নৃত্য এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে আত্মবিসর্জন অনবদ্য শিল্প সুষমা লাভ করেছে। **পুতুল নাচের ইতিকথা ঃ-** পল্লীজীবনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আছে - গাওদিয়া গ্রামের জীবনের জটিল ও সমস্যাপূর্ণ চিত্রণ এখানে পাওয়া যায়। পল্লী জীবন চিত্রনে রোমান্সের মায়াকে পরিহার করে দুঃখ বেদনা দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ জীবনের কথা লেখক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রধান পু(ষ শশী ডাক্ত(ার অনন্য চরিত্র। সে বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিকিৎসক কিন্তু পল্লীগ্রামই তার কর্ম(ে ত্র। গ্রামের একঘেয়ে ধূসর জীবনচর্যা তার, সে কতর্ব্য পালন করে উদাসীন ভাবে নিরাসক্ত(হয়ে। কলকাতায় শি(াপ্রাপ্ত শশীর বন ব্যাকুল উদভ্রান্ত হলেও গ্রামজীবন তাকে আকৃষ্ট করে। এই জীবন সঙ্কীর্ণ মলিন দুর্বল। তা জটিলও বটে। তবু তাকে সে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে। জীবনের এই জটিলতাকে সে অনুভব করে পিতা গোপাল, বোন বিন্দু, রহস্যময়ী কুসুম নির্লিপ্ত উদাসীন কুমুদ ও তার অনুরূপ স্ত্রী মতির মধ্যে। অপরের বিবাহিত পত্নী কুসুমের প্রতি শশীর এক দুর্বোধ্য বিচিত্র আকর্ষণ আছে যদিও তা কোনোদিন পূর্ণতা পায়নি। বিজ্ঞাননিষ্ঠ নিরাসক্ত(অথচ জীবনের সঙ্গে সংবদ্ধ শশী যেন মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রতিরূপ। উপন্যাস অদৃষ্টবাদের প্রকাশও আছে। কুসুমের বাবা অনন্ত শশীকে বলে - ''সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর এক, চিরকাল এম দেখে আসছি ডাক্ত(ারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।'' উপন্যাসের শেষেও ' এক অজানা শক্তি(র অনিবার্য ইঙ্গিতে' মানুষের অপরিবর্তনীয় গতিপথের নানা কথা বলা হয়েছে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' — মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। জৈবিক তাড়িত নর-নারীর অন্তরে গোপন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই গ্রন্থে। যন্ত্রনাকাতর শরীর, নি(চ্চার ভালোবাসা, গোপালের অপরাধী পিতৃহৃদয়, বিন্দুর অস্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন, শশীর প্রতি কুসুমের অন্ধ — আকর্ষণ সবকিছু মিলিয়ে গ্রন্থটি অসাধারণ ব্যাপ্তি ও গভীরতা পেয়েছে।

পদ্মানদীর মাঝি ঃ- মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পদ্মাকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে পদ্মানদীর ধীবরদের বিচিত্র জীবনধারা এতে ধরা পড়েছে। ওইসব নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবনচর্যা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কলহ সংঘাত, প্রেম প্রতিঘাতের আবর্ত রচনা করেছে যার মধ্যে জীবনতরী অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। ''উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সুক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ। ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির (ুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ।'' কুবেরের সঙ্গে কপিলার নিষিদ্ধ অনৈতিক সম্পর্ক জটিল মুহূর্তের রচনা করেছে - শেষ পর্যন্ত উভয়েই আপনা আপনাপন সংসারকে পরিত্যাগ করে অনির্দেশ্য অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে উপন্যাসের সর্বাপে(া বিচিত্র চরিত্র হোসেন মিয়া। তার প্রভাব তাকে প্রায় বিধাতার মত প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। সমুদ্রের মধ্যে তার আবিষ্কৃত দ্বীপটি গ্রামের মানুষের কাছে কল্পলোকের বার্তা বহন করে এনেছে যার মোহ আচ্ছন্ন মানুষ সেই অচেনা অজানা রহস্যময় জীবনকে বরণ করার জন্য উদভ্রান্তের মত ছুটে চলেছে।

জননী ঃ- উপন্যাস মাতৃত্বের মর্যাদা প্রতিপন্ন করে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' এক নৈরাশ্যময় সমাজ ও জীবনের ছবি। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে সমগ্র দেশে যে সমস্যা সংকট কালো বিকারগ্রস্ত অন্ধকার নেমে এসেছিল উপন্যাসে সেই কথা রূপ পেয়েছে। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে ফ্রয়েড প্রভাবিত যৌনকল্পনা ও মনস্তাত্ত্বিক বিকার ও জটিলতার ছবি সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে। প্রতিবিম্ব তে রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ।

ছোট গল্পের (ে ত্রেও মাণিকবাবুর মৌলিকতার শেষ নেই। ১) পাশ ফেল, ২) হারানের নাতজামাই ৩) সরীসৃপ, ৪) ভেজাল, ৫) বিষাক্ত(প্রেম প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির ছোট গল্প। তাঁর এই সমস্ত ছোটগল্পে আমরা দেখি নির্মমজীবন সত্যকে। যেখানে সাধারণ নিম্নবৃত্ত মানুষরাই অগ্রনীভূমিকা নিয়েছিল।

তাঁর উপন্যাস ও ছোটো গল্পে অর্থনৈতিক বৈষম্য পীড়িত নি(পায় নিঃসহায় মানুষের বিদ্রোহী চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। বি(্বযুদ্ধের পর বাঙালী সমাজে যে অব(য় ও রূপান্তর দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে তাঁকে নিরপে(বিশ্লেষণ মেলে মাণিকবাবুর রচনায়। তাঁর আঁকা চরিত্রগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং অভাবে - অনটনে (ত-বি(ত। তবুও তাঁরা জীবনের পথে নানা বাধার বিন্ধ্যাচল ডিঙিয়ে রক্ত(াক্ত(। পদবি(াভে তারা এগিয়ে চলে, তার কারণ লেখক বি(্বাস করতেন ঘটনার থেকে বা সমস্যার থেকে মানুষ বড়। ভালো- মন্দ, সুখ- দুঃখ, সৎ-অসৎ, ব্যয়-অপব্যয়, পাশ-ফেল প্রভৃতির মধ্যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় মেলে না। মানুষকে খুঁজতে হবে এইসব ঘটনার অন্তরালে। তাই মাণিকবাবু নিরূপায় মানুষের যন্ত্রনা কাতর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণ থেকে সবকিছু বিশ্লেষণ করেছেন এবং খন্ডের অখন্ডের সন্ধান করেছেন।

তাঁর সমগ্র কথা সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি ভাবাবাদী ও রোমান্টিক কাহিনী রচনা করেছেন। মার্কসবাদের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি। এরপর ফ্রয়েডীর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাঁর লেখার মধ্যে মনোবিলনের প্রয়াস ও জৈবিক কামনা - বাসনার প্রাধান্য। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের আন্দোলনে, তেভাগা আন্দোলনের এবং আইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। অন্যায়ের বি(দ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের মনোভাব কৃষক ও শ্রমিক জীবনের সংগ্রামে তাঁর লেখার মধ্যে সবথেকে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

মানুষের মগ্নচেতনার স্তরে যে জৈবিক প্রবৃত্তি সেখান থেকেই তাঁর যাত্রা শু(হয়। এবং এক নতুন সুস্থ সামাজিক জীবনবোধের উত্তরণ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের মানদন্ডে এই তাঁর বিচার চলে না। সেই জন্য কোনো কোনো সমালোচকের মতে — ''অসংলগ্ন, অবাস্তবতা, উদ্ভট কল্পনা ও অসুস্থ মনোবিকার তাঁর

লেখার মধ্যে ল(্য করা যায়।'' তবে এ কথা সম্পূর্ণ রূপে যুক্তি(যুক্ত(নয়। তাই এক কথায় বাংলা কথাসাহিত্যে মাণিক বন্দোপাধ্যায় যে একজন প্রথম শ্রেণির শিল্পী একথা আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে। মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, '' অকালমৃত মাণিক বন্দোপাধ্যায় প্রাগৈতিহাসিক যে শক্তি(কে বি(াস করেছিলেন জীবনের সমাপ্তির অধ্যায়ে সেই শক্তি(র অপরিমিত সম্ভবনা ও সর্বোত্তম সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন। চাষীর মেয়ে, তারই সোনালী ফসল বয়ে আনছিল, কিন্তু সেই ফসল তোলা শেষ হল না, তার বিচ্ছিন্ন পান্ডুলিপির পত্র সংগ্রহ ও গ্রন্থ বন্ধন অসম্পূর্ণই রইলো। আর আগেই তিনি চলে গেলেন।''

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৮ খ্রিঃ)

— নন্দিতা বুনিয়া [2nd Sem. Bengali (H)]

''সংসারে যারা শুধু দিলে(পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, যারা উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসেব নিলে না। নিরূপায় দুঃখময় জীবনে যারা ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই তাদের বেদনাই দিলে আমায় মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের হয়ে নালিশ জানাতে'' — আপন সারস্বত সাধনা সম্পর্কে বনস্পতি শরৎচন্দ্রের এই সত্যচরণের সার্থকতম প্রকাশ তাঁর উপন্যাস এবং গল্পগুলির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত(।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্য গগনে তখন শরৎচন্দ্রের দিব্য জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বাংলা কথাসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর যে নামটি স্বাভাবিক ভাবে মনে উঁকি দেয় তিনি আর কেউ নন'' — অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পাঠকের হৃদয়ে এই লেখকের যথার্থ প্রতিষ্ঠা। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের (ে ত্রে সেই অ(য় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কথা সাহিত্যের অমর স্রষ্টা অপরাজেয় জীবন-শিল্পী শরৎচন্দ্র পাঠকের হৃদয়ের আসনে চির আসীন।

জীবনী ঃ- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায় ১৮৭৫ খ্রিঃ ১৫ ই সেপ্টেম্বর হুগলি জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্র সাহিত্যে সাধনায় প্রেরণা লাভ করেন তার পিতার কাছ থেকে। পাঁচ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর প্যারীপন্ডিত এর পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি দু-তিন বছর শি(া লাভ করার পর ভাগলপুর থাকাকালীন স্থানীয় দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তিতে ভর্তি হন ও পরবর্তীতে ১৮৮৭ খ্রীঃ ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৯ খ্রীঃ শরৎচন্দ্র জেলা স্কুল ত্যাগ করে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে স্কুলে বেতন দিতে না পারায় তাঁকে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। ১৮৯৩ খ্রীঃ পুনরায় ভাগলপুর প্রত্যাবর্তন করলে শরৎচন্দ্র জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং এই বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৪ খ্রীঃ এনট্রান্স পরী(ায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অশৈশব ভবঘুরে ধরণের মানুষ। যৌবনে জীবিকা অর্জনের তাগিদে বহুদিন কাটিয়েছেন ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে। সাহিত্য দরবারে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি প্রবাস জীবন ত্যাগ করে কখনো পানিনসে আবার কখনো বা কলকাতায় বিচরণ করতেন।

শরৎ সাহিত্য বৈশিষ্ট্য ঃ- শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক, অমর, কথাশিল্পী নিপীড়িত, দরিদ্র অভাজনের ব্যথা বেদনার কাব্যকার। তিনি তার সাহিত্যে অসহায় দুর্বল তথাকথিত সমাজ পতিতাদের দুঃখ দুর্গতি ও নানা সমস্যার ছবি এঁকেছেন সহানুভুতি ও গভীর মমতার সঙ্গে। তাঁর উপন্যাসের একদিকে যেমন আছে সমাজের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের ছবি(অপরদিকে তেমনি আছে অসহায় নারী জাতির প্রতি তাঁর দরদী ও মরমী হৃদয়ের এক অপূর্ব প্রকাশ। তাই শরৎ সাহিত্যে দেখা যায় পু(ষ নারীচরিত্রের স্বাভাবিক প্রাধান্য। কিরনময়ী, সাবিত্রী, ষোড়শী ইত্যাদি নারীর সতীদের চেয়ে তাঁর নারীত্বকে দিয়েছেন অধিক মর্যাদা। বিধবাদের প্রতি ছিল তাঁর সমবেদনা।

শরৎচন্দ্রের আর্বিভাব বাংলা উপন্যাসে এক বিপ-ব সৃষ্টি হল। শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে দিয়ে এল বিষয় বৈচিত্র্য, চরিত্রের নতুনত্ব, প্রত্য(সমাজ সমস্যা। সমাজের যে সমস্ত মানুষ নিন্দিত, উপে(ত শরৎচন্দ্র তাঁর দরদি মন নিয়ে তাদের প(অবলম্বন করেছেন। দেখিয়েছেন যে মনুষ্য চরিত্রে ধর্ম এবং মানব মনের সুপ্ত বাসনাগুলো কখনোই মারা যায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতীব জনপ্রিয় এক রাজনৈতিক উপন্যাস, 'পথের দাবি' ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যা নাকি সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনকারীদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ভীষণ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রচনাবলী ঃ- বিদ্যালয় পড়াকালীন শরৎচন্দ্র 'ফণিনাথ' ও 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে দুটি গল্প লেখেন। কলেজ জীবন ত্যাগ করে ভাগলপুর থাকাকালীন তিনি 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'শুভদা' ইত্যাদি উপন্যাস এবং 'অনুপমার প্রেম', 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা' , 'হরিচরন' ইত্যাদি গল্প রচনা করেন।

'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যিক নিদর্শন। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বড়দিদি' উপন্যাসটি সাহিত্য (ে ত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা। চরিত্রহীন উপন্যাস প্রকাশের পর তাঁর অতুলযশ অর্জন হয়ে থাকে। তারপর 'দেবদাস' অর(নীয়া, 'বিপ্রদাস' , 'দেনাপাওনা', 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'বামুনের বিয়ে', 'দত্তা', 'শেষ প্র(ে', 'পথের দাবি' প্রভৃতি উপন্যাস ও উপন্যাসোপম বড় গল্প রচনা করে লাভ করেন অপরাজেয় কথাশিল্পীর অমর আসন। তাঁর রচিত 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। 'অনিলাদেবী' ছদ্ম নামে তিনি বহু সৃষ্টি করেছিলেন।

সম্মান ও স্বীকৃতি ঃ- শরৎচন্দ্র প্রতিভা ও অবদান স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১৩ সালে কলকাতা বি(েবিদ্যালয় থেকে তাঁকে 'জগত্তারিনী' স্বর্ণপদক এবং ঢাকা বি(েবিদ্যালয় থেকে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৩৮ সালে বি(েবিদ্যালয় কর্তৃক বি.এ. পরী(ায় বাংলা প্র(েপত্রের প্র(েকর্তা হিসেবেও তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ ঢাকা বি(েবিদ্যালয় থেকে তিনি ডি.লিট উপাধি ও পেয়ে থাকেন। দেশবাসী তাঁকে 'কথাশিল্পী' এবং 'স্মরণীয় শিল্পী' হিসাবেও আখ্যা দিয়ে থাকেন।

*** অসুস্থতা ও জীবনাবসান ঃ-** ১৯৩৭ খ্রীঃ সময়কালে শরৎচন্দ্র প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেওঘর থেকে ফিরে এসে শরৎচন্দ্রের যকৃতের ক্যান্সার ধরা পরে। যা তার পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ১৯৩৮ খ্রীঃ ১২ জানুয়ারী বিশিষ্ট্য শল্যচিকিৎসক ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায় তার দেহে অস্ত্রোপচার করলেও শেষ র(া করতে পারেননি। চার দিন পর অর্থাৎ ১৬ ই জানুয়ারী সকাল দশ ঘটিকায় শরৎচন্দ্র শেষ নি(াস ত্যাগ করেন।

পরিশেষে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বি জনপ্রিয়তার শিখরে তাই অধিষ্ঠিত আজও। এককথায় শরৎচন্দ্র ছিলেন কথা সাহিত্যের মর্ত্য অবতরনে সাহায্যকারী ভগীরথ যিনি উৎসদ্বারের সবরকম বাধা দূর করে অনন্ত পথ অবারিত করে দিয়েছিলেন পাঠকদের কাছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক উচ্চ আসনে অধিকার করে আছে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

— অনন্যা সাহা [2nd Sem. Bengali (H)]

রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর দ(িণ ২৪ পরগণার হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামধন শিরোমনির পুত্র রামনারায়ণ বাল্যকালে শি(া লাভ করেন চতুষ্পাঠীতে। পরে সংস্কৃত কলেজে। কুলীন বংশের সন্তান রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা ও করেছেন দীর্ঘদিন। তিনি বাংলার প্রথম মৌলিক নাট্যকার ছিলেন। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা নাটকে (চি বদল ঘটিয়েছিলেন যে কয়েকজন নাট্যকার তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। বাস্তব ও কৌতুক নাটক রচনার জন্য তিনি নাটুকে রামনারায়ণ নামে খ্যাতি পান। রামনারায়ণের পূর্ববর্তী ও সমকালীন নাট্যকারেরা যেখানে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার ভাবনা থেকেই নাটক লিখেছিলেন সেখানে এই নাট্যকার নাটক লিখেছেন সামাজিক সমস্যা চিত্রিত করার উদ্দেশ্য মাথায় রেখে। তাঁর লেখা নাটকগুলিকে নিম্নোক্ত(শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

১) **সামাজিক নাটক** ঃ- 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪), 'নব নাটক' (১৮৫৬), 'স্বপ্নধন' (১৮৭৩)।

২) **পৌরাণিক নাটক** ঃ- '(ক্মিনী হরণ' (১৮৭১), 'ধর্ম বিজয়' (১৮৭৫), 'কংসবধ' (১৮৭৫)।

৩) **অনুদিত নাটক** ঃ- 'বেনী সংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (১৮৬০), 'মালতী মাধব' (১৮৬৭)।

৪) **প্রহসন** ঃ- 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (১৮৬৫), 'উভয় সংকট' (১৮৬৯), 'চ(ু দান' (১৮৬৯)।

অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ঃ- ১) গদ্য রচনা ঃ 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩), 'প্রকাশ্য বত্ত্(তা' (১৮৫৭)

২) সংস্কৃত রচনা ঃ 'মহাবিদ্যাধন' (১৮৭০), 'আর্য শতকম্' (১৮৭২), দ(যজ্ঞম্' (১৮৮১)।

কুলীনকুল সর্বস্ব ঃ এটি রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা প্রথম নাটক। এই নাটকে কৌলিন্য প্রথার দোষ ও অসংগতিগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকে কন্যা দায়গ্রস্ত এক পিতা চার কন্যার অনেক বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে দিতে না পেরে এক কুলপালক ষাট বছর বয়সের এক কুলীন ব্রাহ্মনের সঙ্গে কন্যাদের বাধ্য হয়ে বিয়ে দেন।

এই নাটকের নামকরণ পূর্বস্থিরিকৃত হলেও এ নাটকের বিষয়বস্তুতে দেখা যায় কুলীনের কুল র(ায় এখানে যথাসর্বস্ব হয়েছে কুলপালকের, তিনি কন্যাদের কথাও ভাবতে পারেননি তাছাড়া কুলসর্বস্ব নামে একটি কুলীন চরিত্র রয়েছে এ নাটকের কেন্দ্রে। তাই তার নামে এ নাটকের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

গর্ভাঙ্কবিহীন ৬টি অঙ্কে বিন্যস্ত হয়েছে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' - এর নাট্য কাঠামো। ১৮৫৮ সালে এই নাটকটি চুঁচুড়ায়, অভিনীত হয়েছিল। সেখানকার কুলীন ব্রাহ্মনেরা (িপ্ত হয়ে উঠেছিল এ নাটক দেখে। 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকের প্রধান ল(্য কৌলিন্য প্রথার বিভৎসতা চিত্রণ এবং সেই কৌলিন্যের শিকার কুলীন তনয়াদের বেদনাময় জীবনউৎকণ্ঠার উপস্থাপন। পু(ষ চরিত্র এখানে শাসক ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও তারা গৌণ। কুলপালক ছিলেন প্রথার দাস — অর্থ থাকা সত্ত্বেও কুলীন পাত্রের অভাবে কন্যাদের বিয়ে দেননি তিনি। কুলীন অপাত্রে কন্যাদান করেছেন। অবিবাহিতা বয়স্ক কন্যার মাতার দুঃখ — তাদের কুমারীত্ব মোচনের সংবাদে তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। নারী চরিত্র অঙ্কনে রামনারায়নের পারদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছে।

নব নাটক ঃ 'নব নাটকটি' বহুবিবাহের কুফল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রচিত। নাটকের উৎসর্গ পত্রে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বইটি উৎসর্গ করতে গিয়ে লেখা হয়েছে — 'ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথার নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ'। পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত এ নাটকটির নাম নবনাটক হলেও এতে কাহিনীগত কিংবা উপস্থাপনা কোনো(ত্রেই নতুনত্ব নেই। ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী ঠাকুর বাড়ির রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এটি নয়বার অভিনীত হয়। সোম প্রকাশ পত্রিকায় এই অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়।

(ক্মিনী হরণ ঃ পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে বাস্তব পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলির অলৌকিক মহিমাকে ছিন্ন করে লৌকিক হাবভাব, কথাবার্তায় নাটককে সরস করে তুলেছেন নাট্যকার। এটি পৌরানিক মিলনান্ত নাটক। নাটকটি ৫টি অঙ্কে বিন্যস্ত। কৃষে(র (ক্মিনী হরণের বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত।

কংস বধ ঃ এই নাটকে কংসের দ্বারা অত্র(রকে বৃন্দাবনে প্রেরণ, কৃষ(আনয়ন, কংসবধ এবং উগ্রসেনের সিংহাসন প্রাপ্তির পৌরানিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই নাটকের রচনারীতি মূলানুগ ভাষাভঙ্গিও সরস নয়।

রত্নাবলী ঃ- শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'-র অনুবাদ এই 'রত্নাবলী' নাটকটি। এটি ৪টি অঙ্কে রচিত। এই নাটকটি ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক সম্পর্কে বিরূপ হন এবং নাট্য জগতে নাট্যকার মধুসূদন দত্তের আর্বিভাব ঘটল।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ঃ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অনুবাদ এই নাটকটি। এই নাটকটি ৭টি অঙ্কে বিন্যস্ত। এই নাটকটি শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নাটকটিতে গানের গু(ত্ব অনস্বীকার্য।

যেমন কর্ম তেমন ফল ঃ এই প্রহসনে পর স্ত্রীর প্রতি আসক্তি(, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিনামে হাস্যকর শাস্তি দান। প্রহসনটি ২টি অঙ্কে রচিত। এই প্রহসনে কৌতুক রস সৃষ্টি, জলধর চরিত্রের নির্মাণ এবং নাগর যুগলের ক(ন পরিণাম চিত্রনে নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

উভয় সংকট ঃ 'উভয় সংকট' প্রহসনে আছে বহু বিবাহের এক বিশেষ দিক। সামাজিক সমস্যার কদর্যরূপ নয় এখানে হিউমারের স্পর্শে কর্তার দোটানা চমৎকার ফুটেছে।

চ(দান ঃ এই প্রহসনে স্ত্রীর কৌশলে লম্পট স্বামীর চিকিৎসাবিধি বর্ণিত হয়েছে। স্বামী নিকুঞ্জবিহারী স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করে এবং অন্য নারীতে আসক্ত(। স্ত্রী বসুমতী একদিন ছলনার আশ্রয় নিয়ে স্বামীর মনে চেতনার সঞ্চার করে। এই বিশিষ্ট নাট্যকার আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ১৮৮৬ সালের ১৯ শে জানুয়ারি।

নাট্যকারের কৃতিত্ব ঃ ১) নাট্যকার তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে সমকালীন নানা সমস্যা ফুটিয়ে তুলেছেন। ২) তাঁর নাটকগুলি মূলত নাট্যকার মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের আর্বিভাবের পথকে সুগম করেছেন। ৩) ক(ণরস বীররস সৃষ্টিতে নাট্যকার সামর্থ্যের পরিচয় দিলেও নাটুকে রামনারায়নের আসল কৃতিত্ব হাস্য ও কৌতুকরস সৃষ্টিতে। ৪) তিনি গদ্য - পদ্যের মিশ্রণেও সংলাপ রচনা করেছিলেন কোনো কোনো নাটকে।

চর্যাপদ

— বিউটি রায় [2nd Sem. Bengali (H)]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন হল চর্যাপদ। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারে গ্রন্থমালা থেকে এর পান্ডুলিপি উদ্ধার করেন। ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগণ ও দোঁহা' নামে দিয়ে তিনি এটি প্রকাশ করেন কলিকাতায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে। চর্যাপদের পুঁথিটির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ।

চর্যা পুঁথিটি 'সন্ধ্যা' ভাষায় লেখা। প্রধানত বৌদ্ধ সহজিয়া ভি(কের ধর্ম, দর্শন, নীতি, উপদেশ, আচার, আচারণাদি প্রকাশ করতেই এই পুঁথিটির উদ্ভব হয়েছিল। এতে ২২ জন পদকর্তার নাম আছে। এদের মধ্যে প্রধান হলেন - লুইপাদ, কাহ(পাদ, ভুসুকুপাদ, বীণাপাদ, ঢেন্টনপাদ, সবরপাদ, ডোম্বিপাদ প্রমুখ। চর্যাপদ সাহিত্য মূল্যে ও সমকালিন সমাজের চিত্রায়নে বাংলা সাহিত্যে এক গু(ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

* সাহিত্য সমাজের দর্পন, কবিরা সমাজবদ্ধ জীব। তাই তাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে সমাজ তাদের কাব্যে ছায়া ফেলে। চর্যা কবিরা তাদের অধ্যাত্মবোধ প্রকাশ করতে অত্যন্ত সচেতনভাবে তাদের দেখা সমাজের অসংখ্য তথ্য ব্যবহার করেছেন। বৃহত্তর বঙ্গের নবভূমিকায় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দির বাঙালি সমাজ, গৃহ জীবন ও পারিবারিক জীবনের খাঁটি ও বাস্তব চিত্র, সেকালের মানুসের জীবন ও জীবিকা, খাদ্য, বস্ত্র, আমোদ-প্রমোদ, প্রেম-ভালোবাসা সবই চর্যাগীতিতে দেখা যায়।

সমাজচিত্র ঃ - ক) বাসস্থান ঃ- সেকালে উঁচু বর্ণের লোকেরা গাঁয়ের মধ্যে বাস করত। কিন্তু ডোম, চন্ডাল, শবর, ব্যাধেরা বাস করত গ্রামের সীমান্তে, পাহাড়ের বুকে বা উঁচু টিলার মধ্যে ছোটো ছোটো কুঁড়েতে। চর্যায় আছে — 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোড়ি কুড়ি আ/'। অর্থাৎ নগরের বাইরে ডোমদের কুঁড়ে ছিল।

খ) বৃত্তি ঃ- চর্যাপদে এই উপে(ত মানুষগুলির নানা জীবিকা বা বৃত্তির কথা জানা যায়। যেমন - মাঝিরা নৌকা চালনা করে। শবর বা ব্যাধরা শিকার করে, ডোমরা চাঙাড়ি তৈরি করে, তান্তীরা তাঁত বোনে, শুঁড়িরা মদ চোলাই ও বিক্রি(করে, কাঠুরি যারা গাছ ফেঁড়ে পাটা তৈরি বা কোথাও সাঁকো নির্মান করে। সুতরাং নদীমাতৃক বাংলাদেশের শ্রমজীবি সমাজের বর্ণনায় চর্যাপদ মুখর অর্থাৎ খাঁটি গ্রামীন চিত্র অথবা গ্রামের প্রান্তে বসবাসকারি সমাজ বর্জিত মানুষের চিত্র দিয়েই চর্যাপদ পরিপূর্ণ।

গ) বেশভুষা ঃ- চর্যাপদে প্রধানত দরিদ্রের কথা পাওয়া যায় বলে বিশেষ কোনো বেশভূষার উল্লেখ এখানে নেই। তবে তখনকার সবর কন্যার মাথায় ময়ুর পুচ্ছ ও গলায় গুঞ্জার মালা পরিধান করত। কানে কুন্তল ও কানেট, পায়ে নূপুর প্রভৃতির ব্যবহার ও ছিল। উঁচু সমাজে সোনা রূপার প্রচলন ছিল। যোগীরা সেই সময় হাড়ের মালা পড়ত।

ঘ) গৃহস্থালীর জিনিসপত্র ঃ- চর্যাপদে শ্রমজীবিদের চিত্র দেখা যায়, তাই তাদের ব্যবহৃত গৃহস্থালির জিনিসপত্র ছিল খুবই সাধারণ। যেমন - ভাতের হাড়ি, দুধ দুইবার পিটা, বসবার পিঁড়ি ইত্যাদি। আবার অস্ত্রের মধ্যে কুঠার ও টাঙির কথা আছে।

ঙ) খাদ্য দ্রব্য ও ফলমূল ঃ- চর্যাপদে প্রধান খাদ্যের নাম ভাত, তার কথা বলা হয়েছে। আর সেই সময়ে মানুষ শিকার করতে ভালোবাসত, তাই শিকার যা মাংস আনত তা খাদ্য রূপে বিবেচিত হত। এছাড়া ফলের মধ্যে তেতুঁল, কঙ্গুচিনার নাম পাওয়া যায়।

চ) আমোদ প্রমোদ ও উৎসব অনুষ্ঠান ঃ- চর্যাপদের মানুষগুলি দরিদ্র হলেও তাদের জীবনে আমোদ প্রমোদ উৎসব লেগেই থাকত। হাঁড়িতে ভাত না থাকলেও তাদের গৃহে অতিথির আগমন ঘটত। তবুও তারা বিরক্তি(প্রকাশ করত না। বরং তাদের নিয়ে আনন্দে উৎসবে মেতে উঠত।

ছ) সংস্কার বিষয়ক প্রথা ও বিবাহরীতি ঃ- চর্যা গানে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের কথা জানা যায়। সংসারে স্বামী, স্ত্রী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, ননদ ও থাকত। এমনকি কখনও কখনও শালি ও পরিবারের মতো বাসকরত। সামাজিক বিষয়ে বিয়ের স্থান ছিল খুবই গু(ত্বপূর্ণ। সমাজে 'সঙ্গো' নামে একট প্রথারও প্রচলন ছিল।

* সুতরাং কবির ধর্মীয় পরিমন্ডলে এই ভাবে সমাজের যে বিভিন্ন খন্ড খন্ড চিত্র উপস্থাপনা করেছেন তা ঐতিহাসিক গু(ত্ব দান করেছে। কবিদের পর্যবে(ণ শক্তি(ও বাস্তব চেতনা ছিল অতুলনীয়। তাই তারা সেকালের অতি সাধাররণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, মিশ্রিত ক(ণ জীবন চিত্র এমন সরস করে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। তাই বলা যায় চর্যাপদ ধর্মের জন্য লেখা হলেও এতে আজ থেকে হাজার বছর আগের মানুষ বাস্তব সমাজের নানা তথ্য পরিপূর্ন হয়েছে, যা সেই সময়ে সামাজিক ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য দলিলের মতো কাজ করেছে।

বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব

— বিভা মণ্ডল [2nd Sem. Bengali (H)]

' প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বাংলাদেশে' — চৈতন্যদেবের আগমন সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের এই প্রশংসা অত্যুক্তি(নয়। ষোড়শ শতকে এক বৈপরীত্যময় সমাজে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে 'মানুষের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা মানুষের পথনির্মাতা। হতাশ দৈন্যের নিরবধি অশ্রুবাষ্পে আকাশ যখন আকুলিত হয় তখনই ধরার সে কান্নামোচনে মহাপু(ষদের আর্বিভাব ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলার জীবনে সেরকমই এক উন্নতশির আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ শ্রীচৈতন্য। একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি, তিনলোকে চোখের জল ছাড়া আর কিছুই তার সম্বল ছিল না। আর এর দ্বারা তিনি সমগ্র বাংলাকে সর্বমানবিক প্রেম ধর্মে দী(ত করে এক নতুন গতিতে আলোক তীর্থের অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাই বাঙালির কাছে তিনি প্রেমের অবতার, মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। সত্যেন্দ্রনাথ গাইলেন — বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'। তাই মনে হয় বাঙালির চিত্তলোক মন্থন করে যে অমৃত উঠেছে, চৈতন্যদেব যেন তারই ঘণীভূত নির্যাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — ''আমদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মেছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না। তিনি তো সমস্ত মানবকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৪৮৬ খ্রীঃ এর ২৭ শে ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপে চৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। তাঁর বাল্যনাম ছিল নিমাই। ১৭ বছর বয়সে তিনি বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণু(প্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। এরপর গয়ায়

পিতৃপিন্ড দান করতে গিয়ে বিষু(পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তার চিত্ত এখানেই বৈরাগ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। ২৬ বছর বয়সে তিনি বৈষ(বাচার্য কেশবভারতীয় কাছে দী(া নেন। এখান থেকে তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ(চৈতন্য — সং(পে শ্রীচৈতন্য। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে তিনি অমৃতলোকে পাড়ি দেন। চৈতন্যের তিরোধান সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে — সে রহস্য এখনো উন্মোচিত হয়নি।

নবজাগরনের পূর্বে মানবতার মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে ও বাঙালি সমাজ জীবনে এক অবিস্মরনীয় ঘটনা। তাঁর আর্বিভাবের আগে তুর্কী বিজয়ের অভিঘাতে বাঙালি জাতি দিশেহারা ও বিপর্যস্ত। ব্রাহ্মন সমাজে আদর্শ নিষ্ঠা লুপ্ত হয়েছিল। অবৈষ(ব সম্প্রদায়রা তান্ত্রিক ত্রি(য়াধর্ম নিয়ে ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিল। মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বর্ণবিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও উচ্চনীচ জাতিভেদে পীড়িত হয়েছিল মানবাত্মা। সামাজিক নিপীড়নে হতমান নিম্নশ্রেণীভুক্ত(হিন্দুরা ইসলামের শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আত্মর(ার আশ্রয় খুঁজতে চাইল। গোটা হিন্দু সমাজটাকে ইসলাম ধর্ম গ্রাস করতে থাকে। সমগ্র হিন্দু জাতির এই মরনাপন্ন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করলেন — জীবে দয়া, ঈ(রের ভক্তি(, বিশেষ করে নাম ধর্ম, নাম সংকীর্তন। এই অধিকারভেদের দেশ কৃষ(নামে অব্রাহ্মন - চন্ডাল সকলকেই উদার মানবিকতার বাণী শুনিয়ে একাসনে বসার সুযোগ করে দিলেন। তিনি প্রচার করলেন প্রতি মানুষের হৃদয়ে দ্বারে প্রেমের কাঙাল রূপে ঈ(রের নিত্য বিরাজমান, দ্বার খুললেই মিলন ঘটবে। তিনি উদাও কণ্ঠে বললেন 'চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরি ভক্তি(পরায়নঃ' — 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে'। চৈতন্যদেব নবদ্বীপের পথে পথে, পুরীতে রথাগ্রেও সকল জাতের মানুষ নিয়ে শু(করলেন প্রেমের পরমোৎসব - সেখানে যবনহরিদাস হলেন তাঁর পরম অনুগ্রহভাজন। গুন্ডা জগাই -মাধাই পেল তাঁর বু(ঠাঁই। নৃপতি হুসেন শাহ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন — '' যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে। তাঁহার শাস্ত্রমত ক(ন বিধানে।। কাজি বা কোটাল বা হউ কোন জন। কিছু বলিলেই তাহার লইব জীবন।।''

চৈতন্যদেবের সাধনাদর্শনে আমরা আজকের ভাষায় 'গণতান্ত্রিক' বলতে পারি। এইভাবে তিনি এক আত্মীয় ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুললেন। এই বাঙালি প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে এল আমুল পরিবর্তন বৈষ(বীয় বিনয়, তুলসীর গলকণ্ঠী, পুরোহিতের নামাবলী দেহে গঙ্গা মৃত্তিকায় নাম ও পদাঙ্ক ধারণ প্রভৃতি শীল সদাচারে সমাজ জীবন হল সংস্কৃত(সর্বসাধরণের মধ্যে শি(া, উন্নত (চি, ত্যাগ, বিনয়, দয়া, ভক্তি(, সরলতা প্রভৃতি সদগুন গুলির প্রকাশে নতুন বলিষ্ঠ সমাজ তৈরীর মঞ্চ প্রস্তুত হল।

চৈতন্যের প্রভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটল, নতুন ফসলে সমৃদ্ধ হল সাহিত্য। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বাংলা সাহিত্যকে এমন সৃষ্টি প্রেরনায় -প্রানবন্ত করে তুলতে পারেননি। তাই একটি পংক্তি(না লিখলেও শ্রীচৈতন্য ইংরেজ পূর্বযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধান পু(ষ। চৈতন্যের মধ্যযুগের দেবমুখী সাহিত্যে মানব মহিমার জয় ঘোষিত হল।

চৈতন্যদেবের পূত প্রেমময় জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে জীবনী কাব্য নামে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হল। মুরারী গুপ্তের কড়চা স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দ ও লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ(দাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' উৎকৃষ্ট চৈতন্যজীবনী সাহিত্য।

চৈতন্যের আর্বিভাবে বৈষ(ব সাহিত্যে জোয়ার এসেছিল। প্রাক্ চৈতন্যযুগের বৈষ(ব পদাবলীতে লৌকিক প্রেমানুভূতিই ছিল প্রধান। চৈতন্য-জীবনের আলোকপাতে রাধা ও কৃষ(জীবাত্মা -পরমাত্মার প্রতীকে পরিণত হল। তাই চৈতন্য পরবর্তীকালে গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, নরহরি চক্র(বর্তী, নরোত্তম দাস প্রমুখ কবিরা তাঁদের পদাবলী সাহিত্যে মানবরস ও ভক্তি(ভাবুকতার যুক্ত(বেনী রচনা করলেন।

চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ(ব সাহিত্যে 'গৌরচন্দ্রিকা' ও 'অষ্টকালীয় নিত্যলীলা' নামে দুটি নতুন ধারা সংযোজিত হল। চৈতন্য ছিলেন রাধাকৃষে(র যুগল অবতার — বহিরঙ্গে রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ(। তাই কীর্তনিয়ারা রাধা-কৃষে(র লীলা বর্ণনার আগে এই লীলার সাদৃশ্যে গৌরলীলার পদগান করার জন্য 'গৌরচন্দ্রিকা' পর্যায় গাইতেন। এই গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি ছিল নবদ্বীপ লীলার পরমান্নে কর্পূরের মতো।

চৈতন্যের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের কবিরাও বৈষ(ব পদ রচনা করেছেন। ফলে মঙ্গলকাব্যের হিংস্র প্রকৃতির দেব-দেবীরা অনেকটা কোমল মানসিকতার হয়ে উঠল। অন্যদিকে বৈষ(ব পদাবলীর আদর্শে স্বতন্ত্র গীতিকাব্য শাক্ত(পদাবলীর সৃষ্টি হল। বাউল সঙ্গীতেও বৈষ(বতার অল্পাধিক প্রবেশ করল।

অনুবাদ সাহিত্যেও চৈতন্যদেবের প্রভাব কম নয়। অনুদিত রামায়ন, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির পরিবেশ, চরিত্র ও কাব্যরসের উপর চৈতন্যের প্রভাবে ভক্তি(রস প্রধান স্থানার্জন করেছে। তাই এগুলিতে মহাকাব্যিক উজ্জ্বলতা অনেকট ম্লান হয়ে গেছে। লোকসাহিত্য ও বিভিন্ন গীতিকায় 'নদেরঠাকুর' কে নিয়ে বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের কবিরা ছড়া, পাঁচালি, গীতিকা রচনা করলেন। নিমাই-সন্ন্যাস পালা রচিত হতে থাকল।

এমনটি উনবিংশ শতাব্দীতে কবি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বৈষ(ব ভাবাবেশে অনুপ্রাণিত হয়ে যথাত্র(মে 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যের বাংলা সাহিত্যে এই প্রভাবে কথা মনে করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — ''বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশে সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলে সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নতুন ছন্দে-প্রাচুর্যে ও প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষন করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে সামাজিক - সংস্কৃতিক জাগরনে বাঙালীর চেতনা সাহিত্যে, সংগীতে, দর্শনে নানাদিকে অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি তাই মহৎ সংস্কারক কিন্তু কখনই বিপ-বী নন, বিদ্রোহী নন। এখানে তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে তুলনীয়। এইভাবে চৈতন্যদেব তাঁর জীবিতকালে বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যিকে প্রাণরস যুগিয়েছেন এবং তাঁর বাণী শত বৎসর পরেও আপনার দান যুগিয়ে সার্থক হয়েছে। তাই যুগ তাকে সৃষ্টি করেনি তিনিই যুগস্রষ্টা রূপে বাঙালির হৃদয়াসনে চিরস্থায়ীত্ব লাভ করেছেন।

'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার, প্রকাশ, নামকরণ, কবি পরিচয় এবং কাব্য পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করো ?

— পবিত্র মণ্ডল [2nd Sem. Bengali (H)]

ভূমিকা ঃ- দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক 'অন্ধকার যুগের' সূচনা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দির তুর্কী আত্র(মনে বাংলার রাষ্ট্রিক - সামাজিক -সাংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্ত। আদিযুগের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ' ভিন্ন অন্য কোনো সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। যদিও পরবর্তীতে ইলিয়াস শা-এর রাজত্বকালে বাংলা দেশে কিছুটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং বাঙালীর জীবনে নতুন আলোর দ্বীপ বিচ্ছুরিত হয়। ঠিক এই সময়ে বাংলাদেশে এক সাহিত্য সৃষ্টি হয় - 'শ্রীকৃষ(কীর্তন'।

আবিষ্কার ঃ- ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলায় কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গেরস্থ বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে এই পুঁথিটি আবিষ্কার করেন।
প্রকাশকাল ঃ- ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কবির নাম - বড়ু চন্ডীদাস।
নামকরণ ঃ- পুঁথিটির প্রথমে, মাঝে এবং শেষের কিছু পাতা পাওয়া যায়নি। ফলে পুঁথিটির সঠিক নাম জানা যায়নি। পুঁথিটির মধ্যে একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ(সন্দর্ভ' নামটি পাওয়া গিয়েছে। এর জন্যে অনেকে মনে করেন গ্রন্থটির নাম 'শ্রীকৃষ(সন্দর্ভ' ছিল। তবে শেষ পর্বে শ্রীকৃষ(কীর্তন' নামেই প্রকাশিত হয়।
সময়কাল ঃ- পুঁথিটির মধ্যে কোনো সময়কাল নির্দেশকরা না থাকায় পুঁথিটির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তবে ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন বিচার বিশ্লেষন করে অনুমান করেছেন এটি চৈতন্য পূর্ব যুগে রচিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই গ্রন্থের রস আস্বালন করেছেন। অতএব গ্রন্থটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত বলে অনুমান করা যায়।
কবি পরিচয় ঃ- শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যের কবি সম্পর্কে তিন প্রকার ভনিতা পাওয়া যায় — ১) চন্ডীদাস ২) বড়ু চন্ডীদাস ৩) অনন্ত বড়ু চন্ডীদাস। কবির নাম ও জন্মভূমির মাধ্যমে শ্রীকৃষ(কীর্তনের' বড়ু চন্ডিদাস এবং পদাবলীর চন্ডীদাস এক বলে মনে হলেও রচনার ভাববস্তু এবং ভাষার দিক দিয়ে দুই চন্ডীদাসের মধ্যে বহুল পরিমাণ পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু তিনি যে বাসুলী দেবীর পূজারী (উপাসক) ছিলেন তাতে কোনো মতে পার্থক্য নেই। কবির জন্মভূমি বীরভূমের নান্নুর গ্রামে।
কাব্য পরিচয় ঃ- 'ভাগবত' প্রভৃতি পুরানের কৃষ(লীলা বিষয়ক কাহিনীকে সামান্য অনুসরণ করে জয়দেবের গীতগোবিন্দের বিশেষ প্রভাব স্বীকার করে এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রাধা কৃষ(বিষয়ক অমার্জিত গ্রাম্য, গাল গল্পের উপর ভিত্তি করে বড়ু চন্ডীদাস 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যের রচনা করেন। কাব্যটিতে মোট ১৩টি খন্ড আছে — জন্মখন্ড, তাম্বুল খন্ড, দান খন্ড, নৌকা খন্ড, ভার খন্ড, ছত্রখন্ড, বৃন্দাবন খন্ড, কালীয়দমন খন্ড, যমুনা খন্ড, হারখন্ড, বানখন্ড, বংশীখন্ড এবং রাধাবিরহ। সমস্ত খন্ডগুলিকে খন্ড নামে অভিহিত করে কবি কেন শেষ খন্ড টিকে শুধুমাত্র 'রাধাবিরহ' বলেছেন তার কারণ অজ্ঞাত। প্রসঙ্গত 'জন্মখন্ড থেকে 'রাধাবিরহ' পর্যন্ত এর কাহিনী বিস্তার।
কাহিনী সংে প ঃ- ভূ-ভাব হরনের জন্য গোলকের বিষু(র কৃষ(রূপে এবং লক্ষ্মী রাধা চন্দ্রাবলী রূপে জন্মগ্রহন। তারপর তাঁদের লীলা - এই কাব্যের প্রধান কাহিনী। কংসের কারাগারে মাতা দেবকীর গর্ভে ভগবান নারায়ন কৃষ(রূপে জন্মগ্রহন করেন। মর্তে নপুংসক আইহনের সঙ্গে রাধার বিবাহ হয়। পৌরানিক কাহিনীর মাধ্যমে আরম্ভ হলেও পরবর্তী খন্ডগুলিতে রাধাকৃষে(র লৌকিক প্রনয় কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। রাধিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ(বড়ায়িকে দিয়ে পান সন্দেশ প্রেরণ করেন। ত্রু(দ্ধা শ্রীরাধিকা বড়ায়িকে বিভিন্ন রূপে তিরস্কার করেন শ্রীরাধিকা মথুরার হাটে পসরা বসালে কৃষ(কর দাবী করেন। কর দিতে অসমর্থ রাধা কৃষে(র নিকট আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। নৌকা খন্ডে শ্রীকৃষ(মাঝি সেজে মাঝ দরিয়ায় রাধাকে নিয়ে জল ত্রীড়ায় ব্রতী হয়। নিজের অজান্তেই শ্রীরাধিকা কৃষ(অনুগত হয়ে উঠতে থাকেন ধীরে ধীরে। শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হওয়ার সম্মতি পেয়ে শ্রীকৃষ(রাধার সমস্ত দুগ্ধ-দধি মথুরার হাটে বহন করে নিয়ে যেতে সম্মত হন। হাটে চলমান রাধাকে রৌদ্রের উত্তাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ(রাধিকার মস্তকে ছত্র ধারন করে চলেছেন রাধার পিছু পিছু।

রাধাকৃষ(মিলনের জন্য কুঞ্জবন প্রস্তুত। শ্রীরাধা কাম নিপুনী রমনীতে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত। পুরাণ অনুসারে কালিয়াদহে কালীয় নাগ দমন ও গোপীনিদের বস্ত্রহরন। শ্রীকৃষে(র জলকেলী - এসবই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত(হয়।

শ্রীরাধার গলার হার হরন করায় মা যশোদার নিকট শ্রীকৃষ(তিরস্কৃত হন। শ্রীরাধার প্রতি কুপিত হয়ে শ্রীকৃষ(রাধাকে মদন বানে মূর্চ্ছিত করেন এবং পরে বড়ায়ির তিরস্কার রাধাকে বাঁচিয়ে তোলেন। শ্রীকৃষ(মোহন বাঁশি নির্মাণ করে তাতে সুর যোজনা করলে, বংশী শব্দে রাধা মোহিত হয়ে পড়েন। ঘরে তার মন স্থির থাকেনা। তাই তার মুখে শোনা যায় — '' কে না বাঁশি বাত্র বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।'' শেষ খন্ডে, অর্থাৎ 'রাধাবিরহ' শ্রীকৃষ(রাধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। বড়ায়ির প্রচেষ্টায় বৃন্দাবনে রাধা-কৃষে(মিলন ঘটলেও নিদ্রিত অবস্থায় রাধাকে রেখে কৃষ(মথুরা চলে যান। রাধার দীর্ঘ প্রতি(াও বিরহ বার্তা নিয়ে বড়ায়ি মথুরায় যান। কিন্তু কৃষ(ফিরে এলেন না। কাহিনী বিচ্ছিন্ন অসমাপ্ত অবস্থায় এখানেই কাব্যের সমাপ্তি ঘটেছে।

কাব্যমূল্য ঃ- 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যটি রাধাকৃষে(র প্রনয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম কাহিনী কাব্য। এর পূর্বে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষে(র প্রনয় ছিল কিন্তু গীতগোবিন্দের সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যে পৌরানিক ও লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রন দেখা যায়। শ্রীকৃষ(-শ্রীরাধিকাও বড়ায়ি — এই তিন চরিত্রের উক্তি(প্রত্যুক্তি(র মাধ্যমে কাহিনীর অগ্রগতি ঘটেছে। সমালোচকের মতে - ''বাংলা নাটকের বীজ এই সংলাপের মধ্যে নিহিত ছিল।'' শ্রীকৃষ(কীর্তনের ন্যায় শ্রীকৃষ(চরিত্র ভাগবত সত্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁকে গ্রাম্য লম্পট এবং কামুক চরিত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। শ্রীরাধার দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্ন(চির প্রকাশ পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের কুট্টিনী জাতীয় চরিত্র বড়ায়ি। নায়ক-নায়িকার মিলনের এরা নিযুক্ত(, রাধার মাতামহী, বড়াই স্নেহশীলা, পরিহাস প্রিয়া, আমাদের অতিপরিচিত গ্রাম্য মাতামহী। তাঁর জন্যই রাধা কৃষে(র মিলন সম্ভব হয়েছে। রাধার চরিত্র চিত্রনে বড়ু চন্ডীদাস তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে লেখনীর সব জীবন্ত করে তুলেছেন। এই কাব্যের প্রধান আকর্ষন রাধা চরিত্র, রাধা খুবই মানবিক ও জীবন্ত। সুন্দরী যুবতী শ্রীরাধিকা। স্বামী আইহন হল নপুংসক। সে দুঃখ তার একান্ত নিজস্ব। বড়ায়ির মাধ্যমে কৃষে(র প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারেন না।। এইখানেই তার মানবিক সত্তার জয়। শ্রীকৃষে(র সান্নিধ্যে কৃষ(বিরূপা শ্রীরাধার কৃষ(অনুরাগীনি হয়ে ওঠার আখ্যান নিয়েই এ কাব্যের মূল কাহিনী।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের পরে দীর্ঘকাল প্রতী(ার সফল হিসাবে 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্কৃতে পুরান ও লৌকিক কাব্য ধারা — এ দুই এর সংমিশ্রনে কবি যে বিচিত্র কাব্যমূর্তি নির্মাণ করেন, তার সমধর্মীকাব্য কাহিনী মধ্য যুগে বিরল। রাধা কৃষে(র প্রনয় কাহিনী নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আখ্যান কাব্য শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্য। এই কাব্যের পুরানের ভারতীয় কাহিনীর চেয়ে এর মধ্যে প্রচলিত রাধাকৃষে(র প্রনয় কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজ মধ্যে মানব মানবীর জীবন তৃপ্তই এখানে প্রধান উপজীব্য বিষয়। সুতরাং শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথেষ্ঠ গু(ত্বপূর্ণ কাব্য হিসাবে চিরস্মরণীয়।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব

— মালবিকা সরদার [2nd Sem. Bengali (H)]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ঃ- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা নাট্যজগতে একজন উজ্জ্বল ব্যক্তি(ত্ব। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক লিখে তিনি সমগ্র বাংলা দেশময় আলোড়ন তোলেন। জাতীয়তাবোধকে তিনি আন্তর্জাতিক বোধে রূপান্তরিত করেন। '' গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'' মানব চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ও তিনি তাঁর নাটকে স(ম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

জীবনী ঃ- ১৮৬৩ খিস্টাব্দে ১৭ জুলাই নদিয়ার কৃষ(নগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম। তার পিতার নাম কার্তিক চন্দ্র রায় এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। ১৮৮৭ সালে বিলেত থেকে দেশে ফিরে আসার আগেই তার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ১৭ মে সন্ন্যাস রোগে আত্র(ান্ত হয়ে নিজ বাসভবন সুরাধামে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রাণ ত্যাগ করেন।

নাট্য প্রতিভা ঃ- ইউরোপ ঘুরে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মনের জগতে যে আভিজ্ঞতার সঞ্চার হয় তা নাটক লেখার প্রেরণা দেয়। বিলাতে রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখে তিনি নাটকের প্রতি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তখন সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রতিভা ও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি(ত্বের অন্যতম প্রধনা বৈশিষ্ট্য হল প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ। দ্বিজেন্দ্রলাল আমার জীবনে আরম্ভ প্রবন্ধে লিখেছেন — ''আমার কাব্য শক্তি(যাহা ছিল, আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।''

নাটকের শ্রেণীবিভাগ ঃ- দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে সমালোচকেরা চারটি ভাগে ভাগ করেছেন — ১) প্রহসন বা লঘুরসাশ্রয়ী নাটক ২) ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক ৩) পৌরাণিত নাটক ৪) সামাজিক নাটক।

১) প্রহসন বা লঘুরসাশ্রয়ী নাটক ঃ- প্রথম দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কয়েকটি ব্যঙ্গ বিদ্রূপময় প্রহসন রচনা করেন। কল্কি অবতার, বিরহ প্রভৃতি লঘুরসের নাটকের স্থায়ী সাহিত্যিকমূল্য কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট ভাব পরিমন্ডলের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো সামঞ্জস্যই ছিলো না। হাসির সাথে সামাজিক বিষয়ের অধিকার মিলে মিশে সাহিত্য (ে ত্র তাকে প্রহসন নাটক লেখার প্রেরণা দিল। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন বা লঘুরসাশ্রয়ী নাটকগুলি হলো — ১) এক ঘরে (১৮৮৯), ২) কল্কি অবতার (১৮৯৫), ৩) বিরহ (১৮৯৭) ৪) প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), ৫) পুনর্জন্ম (১৯১২), ৬) আনন্দবিদায় (১৯১২) ইত্যাদি।

২) ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক ঃ- ইতিহাসের আখ্যানকে কেন্দ্র যখন নাটক রচিত হয় তখন তা হয়ে ওঠে ইতিহাসশ্রয়ী নাটক, ইতিহাসের তথ্যে জীবনরস বা ঐতিহাসিক রসের সঞ্চার করার মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তার বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকগুলি হলো — ১) তারাবাই (১৯০৩), ২) নূরজাহান (১৯০৮), ৩) প্রতাপসিংহ (১৯০৫), ৪) দুর্গা দাস (১৯০৬), ৫) মেবার পতন (১৯০৮), ৬) সাজাহান (১৯০৯), ৭) চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) ইত্যাদি।

৩) পৌরাণিক নাটক ঃ- নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব উপরে। দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক ও মধুসূদনের পৌরাণিক বিষয় নিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্য সার্থক ভাবে সূচনা করেছিলেন। তার পৌরাণিত নাটকগুলি হলো — ১) পাষানী (১৯০০), ২) সীতা (১৯০৮), ৩) ভীষ্ম (১৯১৪) ইত্যাদি।

৪) সামাজিক নাটক ঃ- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে দুইখানি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন সে রচনাগুলি সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য বর্জিত। তার দুটি সামাজিক নাটক হলো — ১) পরপারে (১৯১২),) ২) বঙ্গনারী (১৯১৬) ইত্যাদি।

নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব ঃ- নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আমরা কখনো ভুলতে পারি না। তিনি লিখেছেন — বাংলা ভাষায় নাট্য সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যান বস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুন্য দেখিতাম। কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাববোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি(যাহা ছিল, আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমত ঃ- দ্বিজেন্দ্র জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেছেন — 'তার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতিসাবধানতার সহিত লিখিত। যেখানে ইতিহাসকার নিরব মাত্র সেখানে তার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুনতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।'

দ্বিতীয়ত ঃ- নবকুমার ঘোষ বলেছেন — যাহারা বাঙালী থিয়েটারে যাইতে ঘৃণাবোধ করিতেন এমন অনেক ব্যক্তি(দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর অভিনয় দেখতে পছন্দ করতেন।

তৃতীয়ত ঃ- ১৩২০ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকায় তার নাটক প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাটকে পরিবর্তন আসিয়াছে।

চতুর্থত ঃ- তাহার ভাষার মধ্যে সর্বত্র গতির আবেগ ও ভাবের উচ্ছ্বাস ল(্য করা যায়।

পঞ্চমত ঃ- ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নূরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ভূমিকা আমরা কখনো ভুলতে পারি না।

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের উত্তরণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দ(তার সঙ্গে গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণির সংলাপ ব্যবহার করেছেন, যা বাঙালীর প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

— অনুপম মান্না [2nd Sem. Bengali (H)]

নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাস্তব জীবন, অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ ও সহানুভূতি বা সমবেদনা তার নাট্য শিল্পের প্রধান ল(ন। নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ ল(ন নিস্পৃহ, প(পাতহীন এক উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দীনবন্ধু মিত্রের সেটাই ছিল মৌলিক সম্পদ।

১) দীনবন্ধু মিত্রের রচনাসমূহ ঃ- দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনের মধ্যে রয়েছে সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৩), জামাই বারিক ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি নাটক লিখেছিলেন তাঁর নাটকগুলি হল নীলদর্পন (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), কমলে-কামিনী (১৮৭৩) ইত্যাদি।

২) দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ঃ- ক) নীলদর্পন ঃ- নীলদর্পন নাটকটিতে নীলকর সাহেবদের, মুখর বিচিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটি সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশের মুখোমুখি হই। এখানে একটি রোমান্টিক প্রেমের ছবি আছে। কিন্তু হাস্য পরিহাসের ল(ণ হল বাস্তবধর্মী ঘনিষ্টতা। এটি রোমান্টিক বলে দানা বাঁধতে পারেনি।

*** কমলে-কামিনী ঃ-** এই নাটকটি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের শেষ নাটক। এই নাটকের অঙ্ক সংখ্যা হল পাঁচটি। এই নাটকগুলির উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল রাজা, বীরভূষন, সমরকেতু, গান্ধারী, সুশীলা, সুরবালা। সুরবালা চরিত্রে বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী' উপন্যাসের বিমলা চরিত্রের প্রভাব দেখা যায়। তিনি এই নাটকটিতে উৎসর্গ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

৩) দীনবন্ধু মিত্রের প্রধান নাটক ঃ- ক) সধবার একাদশী ঃ- সধবার একাদশী তৎকালীন নব্য সভ্যতার ইয়ং বেঙ্গলের বাস্তব চিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য সমাজের চাষীদের অত্যাচার করে চাষের জন্য যে অমানসিক অত্যাচার ও নির্যাতন সমকালকে কলঙ্কিত করেছিল, দীনবন্ধু তাকেই নাট্য সাহিত্যে মূর্ত করে তুলেছেন। ব্রিটিশ শাসকের ভয়ে তিনি নিজের নাম পর্যন্ত ছাপতে পারেননি নাটকে। এই নাটকে দুঃখ-যন্ত্রনা, ব্যথা ও ব্যর্থতা, হাসি- ঠাট্টা সব মিলিয়ে পল্লী বাংলার একটি আশ্চর্য মধুর জনচিত্র ফুটে উঠেছে।

খ) নবীন তপস্বিনী ঃ- নবীন তপস্বিনী কাহিনী দুই প্রকারের নাটকীয় রস। প্রথমতঃ রমনী মোহন তপস্বিনী, বিজয়, কামিনী উপাখ্যান প্রেম ও বিচ্ছেদ মূলক। দ্বিতীয়তঃ জলধর, জগৎশেঠ, মালতী, বিনায়ক উপাখ্যান হাস্যরস মূলক। এই নাটকে অঙ্ক সংখ্যা ৫টি।

গ) লীলাবতী ঃ- এই রচনায় কলকাতা শহরতলীর বাস্তবচিত্র ও হাস্য পরিহাস সাথে যুক্ত(নবীন সভ্যতায় যে দোষ ও অনাচার দেখা যায় ও তা প্রতিরোধ করার জন্য যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে তৎকালীন যুবকের অপরিমিতি ও মদ্যাশক্তি(নীলচাঁদ ও অটলবিহারী চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। তাদের বারাঙ্গনা বিলাস ও চরিত্রহীনতা খলন ও পতন নাট্যকার অঙ্কন করেছেন।

ঘ) বিয়ে পাগলা বুড়ো ঃ- এই নাটকে রাজীব লোচন নামক বৃদ্ধকে নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করা হয়েছে। এই নাটকটি একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত হাস্যরসাত্মক প্রহসন।

ঙ) জামাইবারিক ঃ- ধনী সমাজে ঘর জামাই রাখার প্রবনতার মধ্যে যে নির্লজ্জতা ও স্বার্থপরতা তাই এই নাটকের মূল বিষয়। এই নাটকের অঙ্ক সংখ্যা হল চারটি। উৎসর্গ করা হয়েছে রাসবিহারী বসুকে।

মেঘনাদ চরিত্র

— দীপা মণ্ডল [2nd Sem. Bengali (H)]

যে চরিত্রের গু(ত্বানুসরণে কাব্যের নাম, কাব্য ভূমিকায় সে নায়ক এবং নায়ক চরিত্র গঠনে স্রষ্টা সতত সতর্ক তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের পূর্ণশক্তি(প্রয়োগে। মেঘনাদ চরিত্র গঠনে মধুসূদনের (ে ত্রেও তার অন্যথা হয়নি। সমসাময়িক চিঠিপত্রে মধুসূদন দত্ত মেঘনাদের কথা খুবই সতর্কতার সঙ্গে বহুবার উল্লেখ করেছেন। বন্ধু রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে মেঘনাদ প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখেছেন ঃ "He was noble fellow, and, but far that scoundrel Bivisan, would have kicked the monkey-army into the sea." ষষ্ঠ সর্গ লিখে ওঠার পর তারিখ বিহীন আর একটি চিঠিতে রাজনারায়ণকেই তিনি লিখেছেন — "I have finished the VI book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him." এই "him." মেঘনাদকে বোঝাচ্ছে, যার মৃত্যু ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক কেঁদেছেন মধুসূদন। 'মেঘনাদ' চরিত্রটিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত খুবই ভালোবেসেছিলেন। চরিত্রটি তাঁর কাছে কত জীবন্ত এবং কত গভীরভাবে তাকে ভালোবেসেছেন যে তার মৃত্যুতে তাঁকে এত কাঁদতে হয় তা অনুধাবণ করতে পারলেই তারই বিনিময়ে অনুমান করা সম্ভব কতখানি যত্নের সঙ্গে এ চরিত্র রূপায়ণ করে থাকবেন মধুসূদন।

' মেঘনাদবধ' কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাঠককুলের সঙ্গে নায়ক মেঘনাদের পরিচয় করিয়েছেন প্রথম সর্গের উপান্তে - যুদ্ধ(ত্রে নয়, রাজসভা কিংম্বা রাজপুরীতেও নয়, প্রমোদ কাননে, বিলাসমত্ত অবস্থায়।

মেঘনাদ যখন স্ত্রী প্রমীলার সঙ্গে প্রমোদ কাননে বিলাস ও আমোদে মত্ত ঠিক সেই সময় দেবী লক্ষ্মী ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে মেঘনাদের কাছে আসেন এবং দেশের ক(ণ পরিণতি ভ্রাতা বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ ও তাঁকে জানান। তিনি আরও অবগত হন সে রাম, ল(ণকে তিনি নিশারণে পরাজিত করে এসেছিলেন তাঁরা পুনর্জীবিত হয়ে সেই রাম প্রিয়ানুজ বীরবাহুকে মেরে ফেলেছে এবং শোকার্ত উদ্বিগ্ন, অনন্যোপায় পিতা নিজে প্রস্তুত হয়েছেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। ঠিক তখনই পাঠকগণ পরিচিত হয় - বীর মেঘনাদের সঙ্গে। এক ভাই মারা গেছে যুদ্ধে আত্র(ান্ত স্বদেশ, পিতা দুঃখাভিভূত এবং উদ্বিগ্ন, এমতাবস্থায় মেঘনাদকে প্রমোদকাননে দেখে যে ধারণা আশ্রয় পেয়েছিল পাঠকের মনে, তাকে ভেঙে নাটকীয় ভাবে কাব্যের ঘটনাকেন্দ্রে মেঘনাদকে নিয়ে এসেছেন মধুসূদন। 'ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবানী / মেঘনাদ' এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল - ''... হা ধিক মোরে! বৈরিদল বেড়ে স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে? এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ আমি ইন্দ্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি(ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।'' পিতৃগর্বে গর্বিত, আত্মশক্তি(-সচেতন ইন্দ্রজিৎ বিলাসকুসুম ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং জেগে উঠেছেন। যাত্রা করেছে ঘটনাকেন্দ্রের দিকে। দেশ, পিতা ও বংশমর্যাদার প্রতি কর্তব্যবোধে বীরত্বে উদ্দীপিত মেঘনাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি মনোভাব ও প্রতিটি আচারণকে পাঠক তাই অনন্য অনুকম্পায় অনুভব করে। প্রথম থেকেই পাঠকগণ ল(্য করেছেন মেঘনাদ যথোচিত শিষ্টাচারী ও মার্জিত (চি। এছাড়াও তাঁর চরিত্রে দুটি দিক আমরা ল(্য করি। প্রমোদ কাননে ধাত্রীমাতা প্রভাষাকে দেখা মাত্রই মেঘনাদ সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে প্রণাম করেছেন, তেমনি প্রমোদ কানন থেকে রাজপুরীতে এসে প্রথমেই তিনি পিতাকে প্রণাম করেছেন। এখানে নায়ক মেঘনাদের শ্রদ্ধার দিকটি প্রতিফলিত হয়।

এরপর পাঠকগণ পরিচিত হন তাঁর কর্তব্য পরায়ণ মনোভাবের সঙ্গে। প্রমোদ কানন থেকে ফিরে এসেই তিনি পিতার কাছে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি চেয়েছেন এবং বলেছেন — 'সমূলে নির্মূল করিব পামরে আজি' । এতখানি উত্তেজনায় মাঝেও কিন্তু আমরা ল(্য করি, পত্নী প্রমীলার কাছে কত শান্ত কত প্রেমদ্রব ভাষায় সে বিদায় চেয়েছিল তখন তার আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি(তে সম্ভ্রমাপন্ন না হয়ে উপায় থাকে না। প্রমীলাকে সে বলেছিল — '' ... ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কালগণে রাঘবে। বিদায় এবে দেহ বিধুমুখি।'' আত্মনিয়ন্ত্রণ - শক্তি(র সঙ্গে ল(নীয় তার শিষ্টাচার ও শালীনতা এই শালীনতা- এই শিষ্টাচার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ-শক্তি(তার ব্যক্তি(-স্বরূপের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য।

যুদ্ধের ভেরী যখন বেজে উঠেছে তখন ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের আলাপ যে অসম্ভব একথা অজানা ছিল না মধুসূদনের। কিন্তু তিনি মহাকাব্যের কবি। জীবনের সকাল বিস্তারকে ফুটিয়ে তাঁর যাত্রা। তাই নিপুণ মাত্রাবোধে তিনি মেঘনাদের প্রেমজীবন তথা প্রেমিক সত্তকে বিকশিত করলেন অথচ প্রশ্রয় দিলেন না কোনো প্রগলভতাকে।

মেঘনাদের পিতৃভক্তি(আমরা দেখেছি। সমগ্র পাঠককুল দেখেছে পিতৃগর্বে বুক ফুলিয়ে নিজেকে 'দশননাত্মজ বলেছেন মেঘনাদ। দেখেছি তাঁর পত্নীপ্রেম এবার প্রকাশিত তাঁর মাতৃভক্তি(। যুদ্ধযাত্রার অনুমতি চেয়ে মাকে সে বলেছে — '' ... ও পদ-প্রাসাদে চির জয়ীদের দৈত্য - নরের সময়ে এ দাস!''

ভক্তি(, বিনয়, সেই সঙ্গে কিছুটা আবদারের সুর মিশেছে মেঘনাদের মাতৃ সম্ভাষণে। তাই মায়ের কাছে যুদ্ধানুমতি আদায় করতে গিয়ে সে জানায় যে পিতা তাকে অনুমতি দিয়েছেন পিত-মাতার সম্পর্কে সংহতির প্রতি তার শ্রদ্ধাও প্রকাশিত হয় এই উক্তি(তে। স্মরণ্য যে পিতামাতার সম্পর্কের প্রতি এই শ্রদ্ধা সন্তানের জীবনাদর্শ নির্মাণে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। মেঘনাদ চরিত্রকে গগনচুম্বী মহিমায় উন্নীত করেছে

কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ। এই সর্গেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অসহায়ভাবে মৃত্যু ঘটেছে তার। পিতৃব্য বিভীষণ প্রসঙ্গে তার উক্তি(প্রত্যুক্তি(তে, অথবা, ষষ্ঠ সর্গে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তার পলায়ন পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা বিভীষণের প্রতি সা(াৎ ব্যবহারেও এই বৈশিষ্ট্য প্রভাসিত। রাম-ল(ণ ও তাঁদের বানর সৈন্যদের হত্যা করার হুঙ্কার বহুবার দিয়েছে মেঘনাদ, কিন্তু ল(ণীয় বিভীষণকে সে একবারও হত্যা করার কথা বলেনি বলেছে 'বাঁধ দিব আনি তাত বিভীষণের রাজদ্রোহী!' আরো ল(ণীয় প্রতিবারই সে 'তাত' শব্দটি ব্যবহার করেছে বিভীষণের নামোচ্চারণের আগে। ষষ্ঠ সর্গে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের নির্গমন পথ রোধ করা বিভীষণকে দেখে সে বলে — 'এত(ণে ... জানিনু কেমনে আসি ল(ণ / পাশিল র(ঃপুরে! হায়, তাত উচিত কি তব/ এ কাজ ...?' কিম্বা, বিভীষণ নিজেকে 'রাঘবদাস'' পরিচয় দিলে সে বলে - ' হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে' রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !' ভৎর্সনা আছে। কিন্তু শালীনতা ল ঁঘণ করে নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়। বস্তুত যুদ্ধের উত্তেজনায় মেঘনাদ যদি আত্ম নিয়ন্ত্রণ হারাতো তবে তার চরিত্রের অন্য যেদিকই ফুটুক তার প্রেমিক সত্তাটি একেবারেই আত্মপ্রকাশের পথ পেত না। প্রমোদকাননে প্রমীলার কাছে বিদায় নেওয়ার সময় তার যে প্রেমার্দ্র সম্ভাষণ শুনেছি, তারপরেও সেনাপতি পদে অভিষিক্ত(হয়ে যখন পরে প্রভাতের মহারণে তার চরম উত্তেজনা থাকার কথা তখনও সে নিজেকে শান্ত রেখেছে। সারাকাব্যে নানা প্রসঙ্গে তাঁর বীরখ্যাতি শুনে, ইন্দ্রজিৎ নামের ব্যাখ্যা বুঝে, কিংবা তার সৈন্যাপত্যা গ্রহণে আপামর লঙ্কা নাগরীর আনন্দোদ্দীপনা ল(্য করে পাঠক বীর হিসাবে তার দৈব-দৈত্য নর ত্রাস মহিমায় প্রত্যয়িত হয়েছিল, কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে অত্যন্ত ক(ণভাবে মেঘনাদ মারা গেল। বীরত্ব বা রণকৌশল কিছুই কাজে লাগাতে পারল না মেঘনাদ। বিনা যুদ্ধে নিরস্ত্র অবস্থায় তাকে মরতে হল পূজাগৃহে। তবু ল(ণ -এর অস্ত্রে তাঁকে মারা সম্ভব হয়নি। আনতে হয়েছে দৈবাস্ত্র। মধুসূদনের নিজের কল্পনা এবং এই কল্পনা কৌলীন্যেই তিনি পাঠকের কাছে প্রমাণ দিলেন যে, মেঘনাদকে ল(ণের প(মারা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সে সত্যিই দেব-দৈত্য-নর ত্রাস। রাবণের পরিণতির কারণ নিয়ে প্র(উঠতে পারে, কিন্তু তার পুত্রের পরিণতি সম্পূর্ণ নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত।

'মরে পুত্র জনকের পাপে' — কিম্বা 'প্রাক্ত(নের ফলে, যাই বলা হোক না কেন, মেঘনাদের মৃত্যুবীজ যে তারই মধ্যে নিহিত নেই, তা অস্বীকার করা যাবে না। এ চরিত্র - পরিকল্পনায় কবি রামায়ণ থেকে কতখানি সরে এসেছেন এবং তাকে উপস্থাপনা করেছেন গ্রীক নায়কের আদর্শে।

ত্রিভুবণ বিজয়ী বীর, স্বদেশপ্রেমিক, পিতৃ-মাতৃ ভক্ত(, পত্নীপ্রেমিক, ভ্রাতৃপ্রেমিক, নিজগুণে র(াকুলের ভরসা মেঘনাদই 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রধান আশ্রয়। যা কিছু পৌ(ষের, যা কিছু সুন্দর তারই সমবায়ে গড়া। এ চরিত্র মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি, গাম্ভীর্য এবং দীপ্তিতে মধুসূদনের মহাকবি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বা(র।

আট বছর আগের একদিন কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুচেতনা

— জয়শ্রী মণ্ডল [4th Sem. Bengali (H)]

বিংশ শতকের জটিল মনের আশ্চর্য প্রতীক কবি জীবনানন্দ দাশ। যুগের তীক্ত(অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত বর্তমানে জটিল মানসিকতা, নিরালার চৈতন্যের চিন্তা জীবনানন্দের কবি চেতনাকে প্রভাবিক করেছে। যুগের অব(য়ের মধ্যে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেছেন। এই ক্লান্তি তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। এই ক্লান্তি থেকে এসেছে মৃত্যুচেতনা। তিনি ছিলেন মগ্ন চৈতন্যের কবি-মৃত্যু তাঁকে নিয়ে গেছে মগ্ন চৈতন্যের গভীরে।

জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' কাবযগ্রন্থের অন্তর্গত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি কবিচিত্তের একগ্রহণভাবের প্রকাশ। ১৯৪৪ খ্রিঃ 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর তার বহু আগে ১৯৩৬ খ্রিঃ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে 'বোধ' কবিতায় যে বোধের কথা কবি জীবনানন্দ দাশ বলে ছিলেন তা হল — তবু কেন এমন একাকী? / তবু আমি এমন একাকী। একাকীত্ব নয়, একাকী বোধই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় মানুষটিকে আত্মহননে প্ররোচিত করেছিল।

কথিত আছে কবি জীবনানন্দ দাশের বাতির পাশে একটা মর্গ ছিল। একদিন কবি জীবনানন্দ দাশ এবং তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ সেই মর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেদিন কবি দেখেছিলেন সেই লাশকাটা ঘরের টেবিলের ওপর একটি মৃতদেহ রাখা ছিল। তার ঠিক পরে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব জীবনানন্দ দাশকে ভীষণভাবে প্রবাহিত করেছিল। মানসিক চিন্তার তিনটি স্তর ফ্রয়েড তুলে ধরেছিলেন। আর সেই তিনটি স্তর হল ইড, ইগো, সুপার ইগো। মানব জীবনে চাহিদার শেষ নেই আশাতেই মানুষ বাঁচে। জীবনে চাওয়া-পাওয়ার খাতা খুললেই না পাওয়া জিনিসগুলোর খালি হিসেব করতে বসি। আর এই সমস্ত রকম চাহিদা 'ইড' এর অর্ন্তভুক্ত(। 'ইড' জন্ম হতেই থাকে এবং ইগো এমনভাবে মানুষকে প্ররোচিত করে যে, মানুষ অসামাজিক কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না। এরপর আসে সুপার ইগো, যাকে বলা যেতে পারে মানুষের বিবেক। ইড যখন মানুষের কামনা বাসনা পূরণে উদ্দীপ্ত করে, সুপার ইগো তখন বাধা দেয়। সুপার ইগো সবসময় মানবিক চাহিদার উর্দ্ধে থেকে ভালো কাজ করতে উদ্দীপিত করে।

সর্বশেষে আসে, ইগো, যা আমাদের বিশ্লেষণ (মতা এবং যুক্তি(তর্কের সাথে চিন্তাভাবনা করতে শিখায়। এককথায় ইড ও সুপার ইগো মাঝে সামজস্য র(াকারী। কেবল যদি কারো ভিতর ইড কাজ করে তবে সে অমানুষ বা উন্মাদ হয়ে যেত।

তারপর কবি জীবনানন্দ দাশ লিখলেন— ''শোনা গেল লাসকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে(কালরাতে ফাল্গুনের .. সাধ।'' আর কবিতার নাম দিলেন - 'আট বছর আগের একদিন' ।

আলোচ্য 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় যে মানুষটি নামগোত্রহীন শুধুই মানুষ আত্মহত্যা করেছিল কোনো এক অজ্ঞাতপূর্ণ বোধের তাড়নায়। যে মানুষটির জীবনের স্বাদ কোথাও রাখেনি কোনো খাদ, তাঁর জীবনে সবই ছিল স্ত্রী, শিশু, গৃহ, প্রেম, ভালোবাসা, আশা। তবুও কেনো ফাল্গুনের চাঁদনী রাতের শেষ পর্বে কোনো আন্তরিক তাগিদে মানুষটি আত্মহত্যা করলেন।

মানুষটি গ্রহণ মৃত্যুর অন্ধকার থেকে আর কোনোদিন জেগে ওঠবে না আর পেঁচা, স্থবির ব্যাঙ, মশা, রক্ত(ক্লেদ বসা ভোগী মাছি এবং ফড়িং এর মানুষেরমত চেতনা থেকে উদ্ভূত ক্লান্তির ভারবহন করতে

হয় না। তাই জীবনের প্রতি তাদের অনুরাগ অনুমেয়। যে মানুষটি আত্মহত্যা করেছিল যখন নির্জন অন্ধকারে একাকী একগাছা দড়ি নিয়ে 'জোনাকির ভিড়' অ(েথের শাখা যারা সকলই সজীব চঞ্চল বর্দ্ধমান তারাও কি কোন প্রতিবাদ জানায়নি। রাতের অন্ধকারে যে সুযোগ সন্ধানী পেঁচা সেও কি বাঁচার আনন্দটুকু সঞ্চারিত করতে পারে না মানুষটির মধ্যে।

পৃথিবীর আনন্দময় জীবনের স্বাদ হেমন্তের বিকেলের পাকা যবের গন্ধ এই সব উপে(া করে মানুষটি ছুটে গিয়েছিল জীবনের স্বাভাবিক প্রবনতা কে উপে(া করে মর্গে আপনার আশ্রয় খুঁজতে। কিন্তু রক্ত(মাখা থ্যাঁতা ইঁদুরের মত মানুষটি আশ্রয় নিয়েছিল মর্গের টেবিলে। তার জীবনে ছিলনা কোনো নারী প্রেমের ব্যর্থতা, কোনোরকম স্বেচ্ছামৃত্যু। কেন এই আত্মজিজ্ঞাসায় কেন নিজেকে মৃত্যুর হাতে সর্মপনের দুর্নিবার তাগিদ ? উত্তর দিয়েচেন কবি - নারী, প্রেম, শিশু, সংসার - মানুষের জীবনে এ সবই শেষ কথা নয় - ''অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়, আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তে(র ভিতরে খেলা করে '', এই বিপন্ন বিস্ময় যখন মানুষের অর্ন্তনীত রক্তে(র ভিতরে খেলা করে তখন হয়তো ইড আর সুপার ইগোর দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত লাসকাটা ঘরের টেবিলটাই হয় শেষ আশ্রয়।

আমরা জানি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সমুদ্রের গভীর থেকে নীল তিমিরা সমুদ্র সৈকতের কাছাকাছি এসে আত্মহত্যা করে। যে কারণে জীবনের সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বি(েবন্দিত সাহিত্যিক ভার্জিনিয়া উলফ নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলেন। ক্লান্তির ভারে জীবনটা ব্যর্থ আর্বজনা মনে করে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাব(ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁদের জীবনে কোনো কিছুরই তো অভাব ছিল না তবে কেনো আত্মহত্যা? হয়তো জীবনের সব স্বাদ পেলে শেষে জীবনটাই হয়ে যায় বিস্বাদ।

সেই প্রৌঢ়া পৃথিবীর সুযোগ সন্ধানী সন্তনেরা প্যাঁচার মতই বেঁচে থাকার খাদ্য সংগ্রহ করে ভাবে — '' হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজও চমৎকার আমিও তোমার মতো বুড়ো হব - বুড়ি চাঁদটাকে আমি করে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার(আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।''

পরিশেষে মনে পড়ে যায় গীতার ভগবানের সেই মর্মবাণী — ''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবংজন্ম মৃতস্য চ। তত্মাদপরিহার্য়েহর্থেন ত্বং শোচিতুমর্হসি।'' অর্থাৎ, মৃত্যু অনবরত পরিবর্তনশীল ন(ের সংসারে সকলই অনিশ্চিত, কেবল মৃত্যুই নিশ্চিত। ছায়া যেমন বহুর অনুগামী, মৃত্যু তেমনই দেহীর সঙ্গী। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি এক্সপ্রেশনিস্ট কবিতার চরম দৃষ্টান্ত। কবি বাস্তব সত্যটিকে বোঝানো জন্য এই পটভূমি কল্পনা করেছেন লাশকাটা ঘরের টেবিল এনেছেন এ মৃত্যুর কদর্যরূপ — ''রক্ত(ফেনা মাখা ইঁদুরের মতো', রক্ত(ক্লেদ, 'উটের গ্রীবা', স্থবির ব্যাঙ, 'থুরথরে অন্ধ প্যাঁচা' ইত্যাদি চিত্রগুলি সেই কদর্যতা বৃদ্ধি করে অবশ্য তার Contrast এনেছেন।

সৃজনশীল সাহিত্য সমালোচনারীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য

— মোনালিসা মণ্ডল [4th Sem. Bengali (H)]

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করতে গিয়ে বিশ্লেষণরীতির অনুসরণ করতে চান না। বিশ্লেষণ প্রধান পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ম দৃষ্টি ভালোমন্দ বিচারই মুখ্য। কবি সাহিত্য-সমালোচনাকে পূজা বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ পদ্ধতির বি(দ্ধতা করে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, তাজমহলের সৌন্দর্য এক একটি করে পাথর খসিয়ে দেখে বোঝা যাবে না, স্বতন্ত্র করে এক একটি বৃ(গণনা করলে অরণ্যানীর গহণতা অনুভব করা যায় না। বিভিন্ন অংশকে খন্ড খন্ড করে বিশ্লেষণ করলে তার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং মাহাত্ম্য হৃদয়ংদম করা যায় না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্য- সমালোচনার উদ্দেশ্য পূজা করা - সৌন্দর্যের পূজা, বিচার নয়। রচনার গভীরে প্রবেশ করে তার অনাস্বাদিত সৌন্দর্য লোকটি আবিষ্কার করাই বরীন্দ্রনাথের বেশি আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে গীতি প্রাণ কবি। তিনি একেবারে নিজে করে ফেলেন। বস্তুনিষ্ঠা তাঁর কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নয়। সমালোচনার (ে ত্রেও তার অন্যথা হয়নি। বহু রচনার মধ্যে তিনি আন্তরিক বি(্বাস ও উপলব্ধির সুর খুঁজে পেয়েছেন। বহু(ে ত্রেই তাঁর সমালোচনা এক নতুন সৃষ্টি। 'প্রাচীন সাহিত্যে'। এর নিশ্চিত উদাহরণ মেলে দুইটি প্রবন্ধে 'মেঘদূতে' এবং 'কাব্যের উপে(তা'য়। রবীন্দ্রনাথের 'কুমার সম্ভব ও শকুন্তরা' এবং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ দুইটিতেও অনুরূপ সৃজণশীলতাই প্রাধান্য পেয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ দুইটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মানব প্রেমের একটি আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন। ইন্দ্রিয়বাসনা ও বাহিরের রূপসৌন্দর্যের বিচিত্রতা এবং বিহ্বলতার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, ভাবানুভূতির সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়োজ কামনার মিলন ঘটে, তখনই সত্য লাভ হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার কবিতা এবং নাট্যবলীতে এই জাতীয় প্রেমাদর্শের কথাই বলেছেন, ক্লাসিক্যাল যুগের কবি কালিদাস মানবপ্রেম বিষয়ে এইরূপ কোনো সুস্পষ্ট দার্শণিক ভাবনার অনুগামী ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু এই প্রবন্ধ দুইটিকে ঠিক সৃজনধর্মী রচনা বলা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাসের গ্রন্থ দুইটিকে অবলম্বন করে এই আলোচনা করেছেন। তা সমালোচনা হিসাবে যে অংশতঃ বস্তুনিষ্ঠ, একথা বি(্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু প্রথমোক্ত(প্রবন্ধ দুইটি খাঁটি সৃজনধর্মী প্রবন্ধের উদাহরণ এবং চমৎকার উদাহরণ। 'মেঘদূত' কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতা প্রবলভাবে আলোড়িত করে। এর অবলম্বনে কত কবিতা এবং সাহিত্য রসাশ্রিত প্রবন্ধ যে সৃষ্টি হয়েছে তার সংখ্যা নির্ণয়ও একটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার কাজ। সমালোচনা প্রবন্ধটিতেও ওই একই সৃজনশীল মনোভাবই প্রকাশিত। কবি অতীত মেঘদূতের পটভূমিকায় নবমেঘদূত রচনা করেছেন। এ(ে ত্রে যেন কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা উদ্বোধিত এবং পরিপুষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যগুলির নিজের ভাবধারা আরোপ করে নূতন অর্থ সঞ্চার করেছেন। কালিদাসের কাব্যে যে কথা ছিল অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে সম্প্রসারণের দ্বারা গভীর করে তুলেছেন, যে কথা ছিল না কালিদাসের কাব্যে, তাকে কালিদাসের পরিবেষ্টনীর ভেতরই নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। এ সুর অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর-কালিদাস শুধু অতীতের যবনিকার অন্তরাল হতে নেপথ্যসংগীত রচনা করেছেন, এই নেপথ্য সংগীতের সঙ্গে গভীর সংগতিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুরও এক নূতন মহিমা লাভ করেছে।

কালিদাসের সৌন্দর্যপুরী অলকার মধ্যস্থিতা বিরহিনী য(বধূ নিতান্তই রক্ত(মাংসের প্রিয়া সে পার্থিব নারীমাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অলকা সৌন্দর্যের কল্পলোক। আর সেখানকার প্রিয়া কবির অশরীরী মানস প্রতিমা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ''মেঘদূত'' কবিতাটির কথাও স্মরণ করা যায়।

আমাদের এই আটপৌরে ভাঙ্গাচোরা সংসারের নেপথ্যলোকে যে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যলোক বিরাজ করেছে এবং সেখান হতেই যে জীবনের সকল সৌন্দর্য-প্রেমের রহস্য উৎসারিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রকাব্যের ভিতরে একটি মূল ভাব-বি(াস। সেই অস্ফুট ভাব বি(াসই এখানে রূপায়ন লাভ করেছে কালিদাসের ''মেঘদূত'' কে আশ্রয় করে। তিনি এই প্রসঙ্গেই বলেছেন - ''কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল স্পর্শ বিরহ, আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।''

কালিদাসের 'মেঘদূত' সম্ভোগরসে একান্ত রসিক বিলাসী কবির কাব্য। 'মেঘদূতে'র বিরহ একটা বিরহের বিলাসমাত্র - তা সম্ভোগকেই বিচিত্র ও রমণীয় করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে কালিদাসের ভাবলোক হতে অনেক দূরে নিজের একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করেছেন।

' কাব্যের উপে(তা' প্রবন্ধটিতে কবি অভিযোগ করেছেন 'রামায়ণে'র ঊর্মিলা, 'শকুন্তলা'র অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এবং কাদম্বরীর পত্রলেখা চরিত্রগুলির প্রতি তাদের স্রষ্টা কবিরা উপে(া করেছেন। এই অভিযোগ খাঁটি সাহিত্য সমালোচনা হতে পারত যদি কবি দেখাতে পারতেন কাব্যগত প্রয়োজন সত্ত্বেও এই চরিত্রগুলির প্রতি যথোপযুক্ত(গু(ত্ব আরোপিত হয়নি। তার একটিমাত্র মাপকাঠি আছে - কাব্যটির কেন্দ্রীয় সমস্যার প(তার প্রয়োজনীয়তা। যদি তা একটিমাত্র মাপকাঠি আছে - কাব্যটির কেন্দ্রীয় সমস্যার প(তার প্রয়োজনীয়তা। যদি তা একটি আশ্চর্য সম্ভোবনাপূর্ণ চরিত্রও হয়, কিন্তু কাহিনীর জন্য তার স্বল্প প্রয়োজন থাকে, তবে সে (দ্র ভূমিকাই পাবে। এ(ত্রে লেখক যদি তার বিস্তৃত পরিচয় উপস্থাপিত করেন তবে তা কাব্যের সৌন্দর্য সংহতি এবং ভারকেন্দ্রটি বিনষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথের এটা অজানা নয়। 'কাদম্বরী'র কাহিনীর দিক দিয়ে পত্র লেখা চরিত্রটি একেবারেই অবাস্তব অলংকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পত্রলেখার অনুরূপ অবস্থায় স্থাপিত এক যুবতী নারীর সম্ভাব্য মনোভাব আবিষ্কার করেছেন এবং তার আলোকে একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত পত্র লেখা রবীন্দ্রনাথেরই। বানভট্টের কাহিনীতে তাকে স্থাপন করা চলে না। সে যুগে অনুরূপ চরিত্রকল্পনা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কল্পিত পত্র লেখা আধুনিক নারী। বিশেষতঃ 'কাদম্বরী' কাহিনীতে পত্রলেখার যে ভূমিকা, তাতে অধিকতর গু(ত্ব সে দাবি করতে পারে না।

বাল্মিকীর 'রামায়ণে' ঊর্মিলা চরিত্রটি গৌন সব গৌনচরিত্র কে পূর্ণ করে তুলতে গেলে যে কাব্যরচনা হয় না, রবীন্দ্রনাথ ইহা ভালোভাবেই জানতেন এবং বর্তমান প্রবন্ধে সে কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত(ও করেছেন। কিন্তু ঊর্মিলা নামটি তাঁর কাছে বড়ো মধুর এই যুক্তি(তে কোনো চরিত্রকে গু(ত্ব দিয়ে বিচার করা চলে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ করেছেন। তিনি ঊর্মিলার দুঃখ - বেদনাকে বড়ো করে তুলেছেন, যা মহাকাব্যের বহু বিস্তৃত ঘটনার অন্তরালে গৌন বলে আবৃত- আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তা একরূপ কল্পনা বলে বের করে, প্রধান করে সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ঊর্মিলার এই বেদনা-পরিকীর্ণ নবরূপটি মনোরম সন্দেহ নাই - কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃজন, বাল্মিকীর সৃষ্টি নয়।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের অনসূয়া -প্রিয়ংবদা চরিত্র দুইটিকেও রবীন্দ্রনাথ কাব্যের উপে(তা বলে চিহ্নি(ত করেছেন। শকুন্তলার মতো তারাও যৌবন সমাগম সত্ত্বেও এতকাল চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব

করেনি। এইবার শকুন্তলার অভিজ্ঞতাকে খুব নিকট হতে উপলব্ধি করে তারা তপোবনে অজ্ঞাত পূর্ব হৃদয়ান্দোলন নামক ব্যাপারটি জানতে পারে। এই অবস্থায় তাদের মনে যে সব বিচিত্র নব ভাবোদয় ঘটে, তার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাদের নবীণ চরিত্রমূর্তি রচনা করেছেন। কালিদাসের নাটক এর উপকরণ যুগিয়েছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি প্রবন্ধ উপভোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উপভোগ্যতার কারণ কবির সৃজনশীলতা - সমালোচনা নয়।

ফুল্লকেতুর পালা ঃ নবনির্মাণে কালকেতু

— শর্মিষ্ঠা নাথ [4th Sem. Bengali (H)]

রামপ্রসাদ চত্র(বর্তীর 'ফুল্লকেতুর পালা' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল কালকেতু। নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে এই কালকেতুর সাথে আমাদের পরিচয় হয় অধিকারীর বক্ত(ব্য অনুসারে ফুল্লকেতুর পালা অভিনয় প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্রে। সেখানে আমরা জানতে পারি কালকেতু ঘুম থেকে উঠে হাই তুলছে। আর ফুল্লরা গিয়েছে কাঠ কুড়াতে। এ থেকে সহজেই বুঝে নিতে পারি নাটকের নায়ক চরিত্রটি কে আর তার আর্থিক অবস্থা ঠিক কোন পর্যায়ে আছে। এরপর নাট্যকার নাটকের মূল আখ্যানে পৌছান।

● নাট্যকার এ নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন মুকুন্দ চত্র(বর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খন্ড থেকে। এই আখেটিক খন্ডে আমরা দেখি ব্যাধনন্দন কালকেতু ও তার জায়া ফুল্লরার দুঃখে ক্লান্তিতে ভরা জীবন ও শেষ লগ্নে বন কেটে দেবীর কৃপায় গুজরাট রাজ্যের রাজা হওয়ার গল্প। তবে 'চন্ডীমঙ্গলের' আখেটিক খন্ডের মতোই এ নাটকেও প্রধান অবলম্বন হল কালকেতু চরিত্রটি। মধ্যযুগের কাহিনীতে কালকেতু চরিত্রটির সঙ্গে দেবতা সংযোগের বিষয়টি থাকলেও এ নাটকে কালকেতু চরিত্রের মধ্যে সেই দেব-দেবতা সংযোগের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন নাট্যকার। এ নাটকে কালকেতু হতভাগ্য দেবতা নন, একেবারেই রক্ত(মাংসের একজন মানুষ কালকেতুর দিন কাটে সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে। তার স্ত্রী ফুল্লরা তার জীবনের একটা বিশেষ অংশ বলে মনে হয়।

● মুকুন্দরাম চত্র(বর্তীর নায়ক কালকেতুর খাদ্যের চাহিদার মতো নানা ফরমায়েস আমরা এ নাটকে দেখি না, এখানে খাবার সম্পর্কে সে অনেকটা সংযত। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার চমৎকার ভাবে কথ্য সংলাপে তুলে ধরেছেন কালকেতু তার স্ত্রীর ফুল্লরাকে বলেছেন — " বৌ, আজ মোর মনের মতো একটু রান্না করতো। বেশি কিছু লয় - এই থোড় বড়ি দিয়া কুমড়া, বেগুনের সুক্ত(া, কলাই এর ডাল, পুইশাকের চচ্চড়ি, মুলার ঘন্ট, চালতার টক, আর সুখদার ঘরে গাই দুধ পেলে একটু পরমান্ন করিস।"

● কালকেতু ব্যাধ তাই তার পেশা ছিল বন্যপ্রাণী শিকার করে মাংস বিত্র(য় করা। যা প্রতিদিন সমান হয় না। ফলে কালকেতুর সংসারে হেঁচকি টান লেগেই থাকে। তবে দরিদ্র হলেও কালকেতু সৎ চরিত্রবান। কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ট বন্যপ্রাণীরা দেবীর চন্ডীর স্মরণ নিলে দেবী চন্ডী তাদের র(া করার জন্য কালকেতুকে শিকার বন্ধ করতে বলেন। তার বিনিময়ে দেবী তাকে বর দিতে চাইলে সে বরদান হিসাবে যা চেয়ে নেয় তা দেখে দর্শকরা অবাক হয়ে যায়। সে বিশাল সম্পদ বা বিরাট বাড়ির আকাঙ্খা করেনি। তার চাওয়া পাওয়া যেন সীমার মধ্যেই বাধা — " এই বর দাও মা, রোজ যেন তিনটা হরিণ,

একটা হাতি আর দুটি দাঁতি মারতে পারি।'' কালকেতু যে কতটা সৎ ও ভালো মানুষ এই চাওয়া পাওয়ার মধ্যে তা স্পষ্ট। যে সমাজে মুরারী - ভাঁড়ুদের মতো দুষ্ট মানুষের ছড়াছড়ি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কালকেতু দর্শকের মনে বিশেষভাবে জায়গা করে নেয়।

● এরপরই আমরা দেখি দেবীর বরেই কালকেতু গুজরাটের বন কেটে সেখানকার রাজপদে অভিষিক্ত(হয়েছে। এই রাজা হওয়ার পরেও সে পূর্বের কথা ভুলে যায়নি। একদা তার সঙ্গী সাথীরাই ছিল তার সভাসদগণ। এই সভাসদগণের সাথে কালকেতুর আচরণ ছিল সর্বদা আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। ফলে রাজার প্রতি ও তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি(ছিল অপরিসীম। মহারাজ কালকেতু ছিল প্রজাবৎসল, সব প্রজা তার কাছে সন্তান সম। সকলের প্রতি তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার রাজ্য শাসনের একমাত্র ল(্য প্রজাদের স্বার্থর(া। তাই অস্ত্রের ঝনঝনানি কালকেতুর রাজ্যে নেই। একজন প্রজাকল্যানকামী রাজার সব গুনই আমরা কালকেতুর মধ্যে দেখি। তবে এই নমনীয়তা তাঁর চারিত্রিক দূর্বলতা নয়। প্রয়োজনে সে কঠোরও হতে পারে, যার দৃষ্টান্ত আমরা পাই ধূর্ত ভাঁড়ু দত্তকে জব্দ করার মুহূর্তে।

● সবশেষে বলা যায়, কালকেতু চরিত্রটির মহান আচরন(ব্যবহার তাকে গোটা গুজরাটবাসীর কাছে প্রাণ প্রিয় করে তুলেছে। তাই কলিঙ্গ রাজার দ্বারা বন্দি হওয়ার পর তার প্রজা ও সভাসদরা জীবনকে বাজি রেখে তাকে তারা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। তবে মুকুন্দরাম চত্র(বর্তীর কালকেতু চরিত্রটি এতটা সত্রি(য় বা জীবন্ত নয়, যে সর্বদা দেবীর মুখাপে(ী। কিন্তু দ্রপ্রসাদ চত্র(বর্তীর 'ফুল্লকেতুর পালা' নাটকের কালকেতু অতিজীবন্ত ও সত্রি(য়। স্ত্রী ফুল্লরার প্রতি যেমন সে দায়িত্বশীল, তেমনি দুঃখের দিনের বন্ধুবান্ধবকে রাজা হওয়ার পরেও সে ভুলে যায়নি। একজন প্রজাদরদী, ন্যায় পরায়ন রাজা হিসাবেও কালকেতু অনন্য। এ কারণে গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালকেতু চরিত্রটি বেশ স্মরনীয়। নাট্যকার দ্রপ্রসাদ চত্র(বর্তীও এই চরিত্রটিকে ম্লান হতে দেননি। তাঁর দ(হাতের কলম স্পর্শে চরিত্রটি আরও বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দেশ ভাগ ও বাংলা সাহিত্য

— সুদীপ্তা দাস [6th Sem. Bengali (H)]

ধরা ভূমির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসত্তার অধিকারী আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল একটি মর্মান্তিক বছর। ব্রিটিশদের প্রবল ইন্ধনের জালে জড়িয়ে গেলেন হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। অতঃপর এলো দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিল দুটি পৃথক রাষ্ট্র। ভারত ও পাকিস্তান। এর পুরোটাই ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এর ফলে প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের নিহত হওয়ার দগদগে স্মৃতি স্বজনরা বয়ে বেড়াচ্ছে আজও।

বি(সাহিত্যে দেশভাগ যেন ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা। ১৯৪৭ সালে অখন্ড ভারত ভাগ নতুন দুটি দেশের গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত পরিবার পারস্পরিক গৃহ বিনিময় করে উভয় রাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করলেও অধিকাংশ মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় বাস্তবতার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অনেককে চলে যেতে হয় জন্মভূমি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে। হাসান আজিজুল হকের মতো অনেককে ভারত ছেড়ে আসতে হয় বাংলাদেশে। এই জন্মভূমি ছেড়ে আসার আঘাতের রক্ত((রণ। নির্মম সময়ের দাগ আমাদের

বাংলা সাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের একটা অংশ গত হয়েছে। যারা বেঁচে আছেন, তাদের বুকে দীর্ঘশ্বাস হয়ে আছে দেশভাগের স্মৃতি।

এই দেশ ভাগকে কেন্দ্র করে অনেক উপন্যাস, স্মৃতি কথন মূলক গ্রন্থ, ছোটোগল্প, সিনেমাও রচিত হয়েছে। যেমন — **উপন্যাস সমূহ ঃ-** * প্রফুল্লরায়ের কেয়া পাতার নৌকা ও (তধারা রয়ে যায়। * শঙ্খ ঘোষের সুপুরি বনের সারি ও সকাল বেলার আলো। * অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ও মানুষের ঘর বাড়ি। * মানিক বন্দ্যোপাদ্যায়ের স্থানে অস্থানে। * জীবনানন্দ দাশের জলপাই হাটি ও বসুমতীর উপাখ্যান প্রমুখ।

স্মৃতি কথনমূলক গ্রন্থ ঃ- * মিহির সেনগুপ্তের বিষাদ বৃ(, * দ(িণা চরন বসুর ফেলে আসা গ্রাম, * মহাশ্বেতা দেবীর বগা বগা বিদিপ্তা, * সুনন্দা শিখদারের দয়াময়ীর কথা প্রভৃতি।

ছোটোগল্প সমূহ ঃ- * সমরেশ বসুর আদাব, * সলিল চৌধুরীর ড্রেসিং টেবিল, * নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পালঙ্ক, * সতীনাথ ভাদুড়ীর জননায়ক, * প্রতিভা বসুর অপরাহ(প্রভৃতি।

গল্পটির নাম 'আদাব'। যার মধ্যে দেশভাগের সাম্প্রতিক ছবি স্পষ্ট। গল্পটির মধ্য দিয়ে আমরা দুটি জাতির (ুধার হিংস্রতার স্পষ্ট রূপ দেখতে পাই। সাড়া জাগানো এক ছোটো গল্প। গল্পটি আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা 'আদাব' নামটির সার্থকতা ও বুঝব। আলোচ্য আদাব গল্পের নিবিড় পাঠ ঃ

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল। শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। বীভৎস নরক সে সময় যেন। রাজনীতির বিষবৃ(সারা দেশ। আগুন লাগল ১৯৪৬ এর দাঙ্গায়। মানুষ পশুতে পরিণত হল, পুলিশের বুটের তলায় মরতে থাকে হানাহানিতে মুমূর্ষ দুই জাতির সাধারণ মানুষ। সেই বাস্তবের ঠিকানা, 'আদাব'। একে অপরকে দেখে সন্দেহের চোখে আল্লাহ আকবর কি 'বন্দেমাতরম' । যুযুধান দুই প(দুভাই হিন্দু মুসলমান। সেই বাতাবরণকে আশ্চর্য দ(তায় রূপ দিয়েছেন লেখক। গলিতে দুটি অপরিচিত জীব তখন প্রায় মুখোমুখি ''স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বি(শ্বাস করতে পারছে না। উভয়েই উভয়কেই ভাবছে খুনি। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আত্র(মণের প্রতী(া করতে থাকে।'' এরপর দাঙ্গা নয়, নরকের বি(দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় জীবন, দুটি ভিন্ন জাতির দুটি মানুষ।

মরনাগ্নির দিনে জীবনের শপথ নেয় মুসলমান মাঝি আর হিন্দু সুতা মজুর। পুঁটলিতে অস্ত্র থাকার সন্দেহ মিটে যায় অচিরেই। পাশাপাশি বসে যেন দুটি সহযোদ্ধা - দাঙ্গার রাজনীতির প্রতি খড়্গ হস্ত বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর দুটি বিবেক। ''আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী? তোমাগো দু'গো লোক মরব, আমাগো দুগা লোক মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারট হইব। - আরে আমিও তো হেঁই কথা কই। হইব আর কী, হইব আমার একটা কলাটা-হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।'' তবু তো মানুষ মারে মানুষকে কেন দুইজনেই অনুভব করে — ''মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি, নইলে এমন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেমরায়?''

জয়ী হয় সম্প্রীতি, কাছে আসে জাত- ভুলে যাওয়া দুটি মানুষ। রক্ত(আর রক্তে(র সম্পর্ক নিকটে আসে - রক্ত(াক্ত(হানাহানি মুছে যায়। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে যাওয়া সন্দেহের বীজ জেগে ওঠে, তবে সম্প্রীতিই জয়ী হয়। গলিতে তাই মুসলিম ভাই পথ দেখায় হিন্দু সুতা মজুরকে। তারা তো বিদ্বেষ চায়নি — ''কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কোথেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে বাজারে দোকানে এত

হাসাহাসি, এত কথা কওয়া-কওয়ি আবার মুহূর্দে পরেই মারামারি কাটাকাটি একেবারে রক্ত(গঙ্গা বইয়ে দিল সব।'' ভাবে আর দীর্ঘনি(শ্বাস ফেলে দুজনে। মানবিকতার জাগরন এখানেই। ঈদে যোগদানের নেশায় মৃত্যু ফাঁদে পা দেয় মাঝি, দীর্ঘনি(শ্বাস পড়ে হিন্দুর। রাস্তায় নিশ্চিত মৃত্যু তবু উৎসবের টানে মাঝি যাবেই, তখন 'সুতা' মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। যদি তোমায় ধইরা ফেলায়। ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে উঠে।'' মাঝি যেতেই - ''উৎকর্ণ হয়ে রইল সে ভগমান - মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে।'' তার আগে বিদায় বেলায় মাঝিও সুতা মজুরকে বলে ''যাই। ... ভুলুম না ভাই এত রাতের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।- আদাব। - আমিও ভুলুম না ভাই - আদাব''

এই ''আদাব'' রাখী বাঁধনের আদাব - দাঙ্গা নয়, রক্ত(নয়, ঘৃণায় নয় - মানুষে মানুষে সম্প্রীতির 'আদাব'। দুটি 'জাতির' দুটি 'মানুষ' হওয়ায় 'আদাব'। গল্পের শেষে বৌ ছেলের চোখের জল চোখে নিয়ে মৃত্যু হয় মাঝির। জীবনের জন্য এই বিভেদহীন আকুতি, মৃত্যুর নিসর্গে ভেদসর্বস্ব হত্যা সর্বস্ব রাজনীতিকে নামহীন মাঝি-মজুর। দুটি মানুষের 'আদাব' জানানোর রূপটি শঙ্খ ঘোষের কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'আদাব' তাই ১৯৪৬ - এর সময়েই 'আমন' এর ডাক দেয়। তাই 'আদাব' সম্প্রীতির মন্ত্রের মনুষ্যত্বের বিকাশের জীবনের উদ্বোধনের সার্থকনামা সৃষ্টি। বিবেকের এই জাগরন, মেকি সভ্যতার মুখোশ খুলে দেওয়া ঐ চার চোখের দৃষ্টি ১৯৪৬ এর কঙ্কাল দেখিয়ে দেয়।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

— অমরেশ ধাড়া [6th Sem. Bengali (H)]

মানিক বন্দ্যোপাধায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের একটি সং(প্ত আলোচনা থেকে উপন্যাসে আঞ্চলিকতার তাৎপর্য ও সার্থকতা অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। প্রমত্তা পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক জীবন ও তাদের দারিদ্র লাঞ্ছিত বেদনালেখ্য এই উপন্যাসের পাঠকদের সম্মোহিত করে। পদ্মা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা মানুষের জীবনসংগ্রাম, তাদের (ধা-তৃষ(া কাম-স্বার্থ-শোক-বিষন্নতা বি(শ্বাস-আকাঙ্খা মুখের ভাষার নিখুঁত বাস্তবতায় ধরা পড়ে - 'জীবনযুদ্ধে জয় পরাজয় একেবারে মিলন সীমান্তে তাহারা বাস করে।' নদীর জলে ভেসে বেড়ানো মাঝিমোল্লা ও তার তীরবর্তী ধীরপল্লীর মানুষদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত(পদ্মা উপন্যাসে চিত্রিত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা, আশা ও আশঙ্কার এক দুর্জ্ঞেয় নিয়ামক। পদ্মার তরঙ্গমালাকে ঘিরে আবর্তিত এই উপন্যাসের কাহিনী এক বিশেষ অঞ্চলকে ঘিরে রচিত(সেই অঞ্চলের মানুষদের যাপনরীতি, সংকীর্ন গ্রাম্য পরিধির মাঝে নিতান্ত সাধারণ মাঝি ও ধীবরদের কামনা-বাসনা, স্বপ্ন-আকাঙ্খা, আবেগ- উচ্ছ্বাসের নিখুঁত চিত্রায়নে কেতুপুর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল এক উজ্জ্বল মানবিক আবেদনে দীপ্যমান এই উপন্যাসে। পদ্মার তীরবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চলের খন্ডাংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ভাসিত করেন এক খেয়ালী নদীর প্রতিপালন ও ধ্বংসের প্রতিস্পর্ধী ভূমিকার নিবিড় সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা পূর্ববঙ্গীয় এক জনগোষ্ঠীর তথা সমগ্র মানবপ্রকৃতির এক আশ্চর্য জীবননাট্য একটি বিশেষ অঞ্চলের বাস্তবতা, ভাষা, আবেগ-সংবেগের খন্ডবৃত্তে ধরা পড়ে মানববিকাশের এক বিস্তৃত বলয়।

ওপরে বিশাল আকাশ, আর তার নীচে পদ্মার ঢেউয়ে ভাসতে থাকা মাছ ধরার নৌকাগুলি, পদ্মা ও তার খালগুলিকে অবলম্বন করে চলতে থাকা মাঝি ও জেলেদের জীবিকা ও জীবনচত্র(, (ধা ও তৃষ(া,

প্রেম ও আসক্তি(তে আঁকড়ে ধরে আন্দোলিত জীবনধারা আঞ্চলিক উপন্যাসের সীমাকে অতিত্র(ম করে জীবনের বিস্তৃততর প্রে(াপটটিকে আভাসিত করে তোলে। সার্থক জীবনশিল্পী মাত্রেই পরিচিত জগতের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত(হন বি(্ব মানবিকতার ব্যপ্তিতে।

পদ্মার তীরবর্তী জনপদের ধীবরপল্লীতে ঢুকলে কুবের - ধনঞ্জয় - গনেশদের জীবনবাস্তবের চিত্রটি ত্র(মে পরিস্ফুট হয়। ধনঞ্জয়ের মতো যাদের নৌকো বা জালের সংস্থান আছে তাদের বাদ দিলে বেশিরভাগ অস্থির, পদ্মার দূর্বার জলস্রোতের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে তারা বিপর্যস্ত। লেখকের সর্বাধিক সাফল্য এই দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষদের জীবনালেখ্য নির্মানে। কোন কবিত্বমন্ডিত ভাষায় নয়, পূর্ববঙ্গের কৃত্রিমতা বর্জিত কথ্য ভাষায়, নিঁখুত বাস্তবতার পরিমিতিবোধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অসমান্য দ(তায় ফুটিয়ে তুলেছেন প্রমত্তা পদ্মার তীরবর্তী মানুষদের সুখ-দুঃখ এবং পদ্মার প্রতিপালন বিনাশের এক আশ্চর্য ইতিবৃত্ত।

ধীবরপল্লী ও কেতুপুরের জনপদ জীবনই পদ্মানদীর মাঝি-র প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে। উপন্যাসের শেষ পর্বে এসেছে হোসেন মিএ(ার ময়নাদ্বীপের প্রসঙ্গটি - সমুদ্র পরিবেষ্টিত যে নির্জন দ্বীপটি পদ্মার মাঝি জেলে জনপদবাসীদের কল্পনায় যুগপৎ আশা আশঙ্কার এক অদ্ভুত আলেয়া। রহস্যাবৃত হোসেন মিএ(ার মতোই রহস্যমন্ডিত ময়নাদ্বীপ যা দূরবর্তী অগ্নিশিখার মতো আকর্ষন করে পদ্মার পাড়ে বাস করা সরল, অশি(ত মানুষদের(প্রলুব্ধ পতঙ্গের মতো তারা ঝাঁপ দিতে চায় সেই অগ্নিসংকেতের ভয়াবহ রমনীতায় হোসেন ও তার ময়নাদ্বীপ পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের জীবনে আর্বিভূত হয় ও মূর্তিমান নিয়তিরূপে। পদ্মার বিস্তার ও তার তীববর্তী অসংখ্য মানুষের জীবনের পরিপূরক যেন এই আদিম দ্বীপখন্ড 'ময়নাদ্বীপ' যাকে ভাষার সজীবতা ও বর্ণনার অনুপঙ্খে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন অসম্ভব এক বি(্বাস্যতা।

উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করেছেন লেখক একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ নানা উপভাষার মিশ্রনের ফলে গড়ে উঠতে পারেনি। সেদিক থেকে এই উপন্যাসের ভাষা সংকীর্ণ অর্থে আঞ্চলিক নয় কুবের মালা কপিলা - রাসু- পীতম - আমিনুদ্দিরা কথা বলে ঢাকা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষায়(আবার নোয়াখালির মানুষ হোসেন মিয়া নোয়াখালি চট্টগ্রাম কখনো বা বিচিত্র মিশ্র উপভাষায় কথা বলেছে। পদ্মানদীর মাঝি যে নিছক আঞ্চলিক উপন্যাস নয় তা প্রমানিত হয় তখন, যখন কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ পর্যন্ত এই উপন্যাসের বিস্তারের পাশাপাশি কুবেরের ভাষা থেকে হোসেন মিয়ার ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের সীমানাকে সম্প্রসারিত করে তোলে।

‘চরিত্র সমাবেশে হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’

— সুদেবী বিশ্বাস [6th Sem. Bengali (H)]

নবনীতা দেবসেন তার হে পূর্ণ তব চরনের কাছে ভ্রমন সাহিত্য টিতে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে ঘটিয়েছেন। চরিত্রগুলি নিম্নে বর্ণিত হল —

সূরয সিং ঃ- হে পূর্ণ তব চরনের কাছে ভ্রমণ সাহিত্যটিকে সূরয সিংয়ের যে পরিচয় আমরা পাই, সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে লেখিকারা শোনপ্রয়াগে পৌছে ‘সুনীল লজে’ ওঠেন। এই ‘সুনীল লজের’ মালিক হলেন সূরয সিং। আসলে তাঁর ছেলের নাম সুনীল। ছেলের নামেই এই লজটির একটা সময় নামকরণ করেন তিনি। এই স্বল্প সময়ে সূরয সিং এর সঙ্গে লেখিকাদের খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়। লেখিকা ও তাঁর সঙ্গীদের সূরয সিং বলেন। ‘‘আমি নিজেই চলে যাব তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে। আমাদের অনেক ঘোড়া আছে। কুছ মুসকিল নেহি হ্যায়।’’

আমরা দেখি, সূরয সিং, পিকোর সাথে গল্প করতে করতে বলেন, যে তাঁর দাদা কোনো এক কলেজের জিওগ্রাফির প্রফেসর। তিনি নিজে লজ চালান। তাঁদের অনেক ঘোড়া আছে, যা সহিস লছমন সিংহের দায়িত্বে পরিচালিত হয়। আমরা সূরয সিংহকে পাহাড়ি রাস্তায় ঘোড়ার পিঠে পিকোকে নিয়ে চলতে চলতে গান গাইতেও দেখি, যা পাহাড়ি গাঢ়োয়ালদের গান। সূরয সিং পাহাড়ি রাস্তায় ছুটে ছুটে ফুল ও তুলতে থাকে, সঙ্গে গাইতে থাকে পাহাড়ি সঙ্গীত ভাটিয়ালি গান।

সূরয সিং ছুটে ছুটে ফুল তুলে, দৌড়ে দৌড়ে গান গায়, দেবানন্দের স্টাইলে ঘোড়ার লেজ মলে দিয়ে, মনের সুখে নিরাপদেই পথ কাবার করলে।’’ এই সমগ্র ভ্রমণ সাহিত্যটিকে অল্প একটু অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সুরয সিং।

মিস্টার মুখার্জী ঃ- ‘ হে পূর্ণ তব চরনের কাছে’ ভ্রমণ সাহিত্যে মিস্টার মুখার্জীর প্রসঙ্গ আমরা অতি অল্পই পাই। এই মিস্টার মুখার্জী হল লেখিকার বন্ধুর দাদা। দিল্লিতে যাওয়ার সময় ট্রেনে মিস্টার মুখার্জী ও তাঁর সপরিবারের সঙ্গে লেখিকার একই কামরাতে দেখা হয়। লেখিকার মুখ থেকে জানা যায় যে, মিস্টার মুখার্জী নগদ বিশ হাজার টাকা বেতনে এক বিদেশি কোম্পানিতে ‘মাস্তানি’ করেন। অথচ বসে মাইনেটা পান। তবে লেখিকাদের এই ট্রেন যাত্রায় মিস্টার মুখার্জীকে সহযোগিতা করতে দেখি। লেখিকার কাছে ট্রেনের টিকিট না থাকায় যখন বিপদে পড়েন, তখন মিস্টার মুখার্জী নিজ দায়িত্বে চেকারের সাথে কথা বলেন এবং এ যাত্রায় লেখিকাদের মান সম্মানের হাত থেকে বাঁচান। তারপর সেখান থেকে লেখিকারা দিল্লিতে পৌঁছান। চারধামে যাত্রার অনেক খরচে কথাশুনে যখন কলকাতাই আবার ফিরে আসবে কিনা ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ও মিস্টার মুখার্জী আবার উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ন হন। ‘‘দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। রাত্রে তো আপনার বন্ধুর বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। ওখানে নিশ্চয় অনেকের সঙ্গেই দেখা হবে আপনার।’’ ‘হে পূর্ণ তব চরনের কাছে’ ভ্রমণ সাহিত্যটিকে এভাবেই বারবার লেখিকার সহযোগীতা করার মধ্য দিয়ে আমরা মিস্টার মুখার্জীর অতিথি প্রীতির পরিচয় পাই।

চন্দন সিংহ ঃ- ‘ হে পূর্ণ তব চরনের কাছে’ ভ্রমণ সাহিত্যটিকে চন্দন সিংহের সঙ্গে লেখিকাদের পরিচয় হয় উত্তর কাশীতে। উত্তর কাশী থেকে ফেরার সময় লেখিকা ও তার সঙ্গীরা আরে সেই বাজার মধ্যস্থ ট্যুরিস্ট লজে না উঠে অন্য একটি লজে ওঠেন। আর সেটা ছিল একটি ডরমিটরি। সেই ডরমিটরিতে লেখিকারা

৪টি খাটওয়ালা ঘর পান। সেই ঘরের সেবক ছিল গাড়োয়ালী যুবক চন্দন সিংহ। এই চন্দন সিংহ হঠাৎই লেখিকাকে আকুল আবেদন করে বলেন — ''আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন না মেমসাব? আমি রান্নাবান্না সব জানি। পাহারাও দিতে পারি। বর্তন মযনা, প্রেস করনা, সব কুছ আতা হ্যায় মুঝকো। পিওনের কাজও পারি। ক্লাস টেন তক স্কুল মে পঢ়া। অংগ্রেজী ভি পঢ়লেতা হুঁ। হিন্দি ভি।''

আসলে চন্দন সিংহের চাকরিটা স্থায়ী নয়, টেমপোরারি সার্ভিস। ছ-মাস তাদের চাকরি থাকে। আর ছ মাস তারা বেকার। এই চন্দন সিংহ আরও বলেন যে, যাত্রীদের সঙ্গে সে দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতায় যেতে চায় অথচ কেউই তাকে নেয় না। এই বছরেই মাড়োয়াড়ি বাবুরা নিয়ে গেছেন তার বন্ধু দান সিংহকে। দান সিং চিঠি লিখে বলেন চন্দন সিংহকে সেখানে যেতে। কিন্তু চন্দন সিংহ রাজি হন না কারণ সে উত্তর কাশীর বাইরে কোথাও যায়নি তাই চন্দন সিংহ লেখিকাকে বলে, ''মেমসাব, লে চলোগে, সাথমে মুঝকো।'' কিন্তু বছর ষোলো সতেরোর একটা কিশোর জুটে যায় লেখিকার সঙ্গে। তার বাবা মোট বইতে গিয়ে মুখে রক্ত(উঠে মারা গেছে তাই সে লেখিকার কাছে কাজ করে। চন্দন সিংহের মতো সেও অকুল আবেদন করে 'মেমসাব কাম দো হামকো সাথমে লে চলো।' এই কাতর প্রার্থনার মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে হিমালয়ের চারধামের অনন্ত সৌন্দর্য ভান্ডারের সবচেয়ে বড়ো অসুখ হল বেকারত্বের সমস্যা বে রোজগারের সমস্যা।

মেসোমশাই ঃ- ' হে পূর্ণ তব চরনের কাছে' ভ্রমণ সাহিত্যটিতে লেখিকা বাঙালি দলের একজন বৃদ্ধকে 'মেসোমশাই' বলে সম্বোধন করেন। এই মেসোমশাই এর সাথে লেখিকাদের ভৈরবঘাঁটিতে প্রথম পরিচয় হয়। চা খেতে খেতে মেসোমশাই, লেখিকাকে বলেন এককালে তিনি বাতে পঙ্গু ছিলেন। কিন্তু এখন পর্বত লঙ্ঘন করেন বিনা কষ্টে। এরপর আমরা দেখি যে মেসোমশাই ও তাঁদের দলটি বাস না পেয়ে জিপে উঠে পড়েন। তখন লেখিকা মেসোমশাই ও তাদের তিন সঙ্গীদের কাছে জিপে একটু আশ্রয় পাওয়ার আবেদন করেন। লেখিকার আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেন '' কেন জায়গা হবে না? যদি হও সুজন তেঁতুল পাতায় ন জন, সবাই মিলে যায়।'' কিন্তু সেই সৌজন্যপূর্ণ কথা বাঙালি দলটি শুনল না। তাঁরা জানালেন জিপ ভর্তি হয়ে গেছে। সেই বাঙালি দলটি চলে যাওয়ার কিছু(ণ পর লেখিকারা একটা বাস পেয়ে যান এবং তাঁরা যখন গঙ্গোত্রীতে পৌছে সেখানকার একটা ট্যুরিস্ট লজে ওঠেন তখনো তাঁদের সাথে মেসোমশাই এর পুনরায় দেখা হয়। মেসোমশাই তার দলবল সবাই একই ট্যুরিস্ট লজে ওঠেন। মেসোমশাই লেখিকাকে দেখে যতখানি খুশি হয়েছিলেন আবার ততটাই লজ্জিত হয়ে বলেন। — ''যাক তোমরা এসে পড়েছ। ইয়ে দ্যাখো, আমি তো বুড়োমানুষ, আমার কোনো হাত ছিল না।'' তারপর (দ্রপ্রয়াগে পৌঁছে লেখিকা ও তার সঙ্গীরা গাড়োয়ালমন্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট লজে ওঠেনি সেখানে আবার মেসোমশাই এর সাথে দেখা হয়। লেখিকা রাতে ঘুমিয়ে পড়লে যে লেখিকাকে ডেকে বলেন - ''এই যে কিছু গাঁজা, কিছু ভাঙ, আমি ভুলে গৌরীকুন্ডে ফেলে গিয়েছিলুম তুমি একটু সঙ্গে নিয়ে যাবে? কেদারনাথকে দেব বলে আমার মানত করা ছিল। তোমরা যখন পুজো দেবে তার সঙ্গে এগুলো যদি ধরে দাও -পৈতে, হত্তুকি, ধূপ, ধুনো এইসব আর কি।'' তারপর লেখিকা মেসেমশাই এর দেওয়া সেই প্যাকেট নেন আর বলেন আপনার মানত ঠিক জায়গায় পৌছে যাবে। মেসোমশাই শুনে খুবই খুশি হন। ' হে পূর্ণ তব চরনের কাছে' ভ্রমণ সাহিত্যটিতে খুব অল্পই আমরা মেসোমশাই এর কথা পাই। মাত্র কয়েকটি অংশে এই চরিত্রটি সীমাবদ্ধ।

কুন্দন সিং ঃ- ' হে পূর্ণ তব চরনের কাছে' ভ্রমণ সাহিত্যটিতে ঘোড়াওয়ালা কুন্দন সিং এর সঙ্গে পাঠকদের প্রথম পরিচয় হয় 'জয় যমুনা মাঈকি' শিরোনামে লেখিকা যে ট্যুরিস্ট লজে উঠেছিলেন সেই লজের গু(মহারাজ, কুন্দন সিংকে নিয়ে আসেন। লেখিকাও তার সঙ্গীদের যমুনোত্রীর পথের সঙ্গী হন ঘোড়াওয়ালা কুন্দন সিংহ ও একটি বালক রবীন্দ্র সিং। কুন্দন সিং সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে খুব ভালো ও প্রথম শ্রেণির সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে খুবই ভালো ও প্রথম শ্রেণির ট্রেনার। পুরো রাস্তা কুন্দন সিং অন্য সমস্ত পদযাত্রী ও অ(েতরারোহীদের যাত্রার নিয়মকানুন শেখাতে শেখাতে এসেছে। মোড়ে বাঁক নেবার সময়ে পদযাত্রীরা কদাচ যেন খাদের দিকে যাবেন না। খচ্চরেরা বাইরের দিকে বাঁক নেয় তারা ঠেলা দিতে পারে। ভাইসাব জানবর কো বিশোয়াস নাহি পাহাড়েকা সইডসে চলনা। কুন্দন সিং ঠিক এইভাবেই সমগ্র পাহাড়ি রাস্তায় সকলকে সাবধান করতে করতে আসেন। পাশাপাশি আমরা এই ভ্রমণ সাহিত্যে কুন্দন সিং এর মধ্যে বাৎসল্য প্রীতিও ল(করি। তার সাথে যে বালক রবীন্দ্র সিং এসেছিল তাকেও প্রতিনিয়ত গাইড করতে থাকেন। রবীন্দ্র সিংহ এর সুবিধা অসুবিধার বিষয়েও তাঁর সমান ভাবে দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই কুন্দন সিং বলছে ''থকতো নাহি গায়েহো? জোরা রেস্ট লোগে? '' সারাপথে কুন্দন সিং রবীন্দ্র সিংকে এতটাই যত্ন করেন যা দেখে লেখিকার মেয়ে পিকো একটা সময় জিজ্ঞাসা করে কুন্দন সিং তার বাবা কিনা? অন্যদিকে কুন্দন সিংহ লেখিকাকে রবীন্দ্র সিং সম্পর্কে বলে। ''রবীন্দ্র সিং কখনও যমুনোত্রী যায়নি তাই ভাবলাম নাহাকর লায়েঙ্গে। এই প্রথমটিপ, বাচ্চা ছেলে। ঘোড়া সামলাতে পারবে কিনা তাই ওকে যমুনার সঙ্গে দিচ্চি। যমুনার কোনো ঘোড়াওয়ালা লাগে না। মোহনের বয়স অল্প ওর সঙ্গে আমি আছি।'' কুন্দন সিং এর এই বক্ত(ব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সহৃদয় মননের পাশাপাশি প্রীতিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিবখ্রিস্টস্বামী ঃ- শিরোনাম অংশে শিবখ্রিস্টস্বামীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর গ্রন্থটির দ্বিতীয়র পর্বে চল্লিশ সংখ্যক অনুচ্ছেদ 'পুনরাপি শ্বেত সন্তকথা' শিরোমনিতে চরিত্রটিতে প্রতি লেখিকার সহমর্মিতা, গভীর ভক্তি(মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্রটির মধ্যে নানা চেতনার স্বর অনুভব করা যায় **যেমন ঃ- প্রথম স্তর ঃ-** শিবখ্রিস্টস্বামীর আসল নাম ত্রি(স। নিবাস ইংল্যান্ড। মাতৃভাষা ইংরেজি। কর্ম সরকারি চাকুরি। ধর্ম ক্যথলিক ধর্ম সন্ন্যাসী। ক্যাথলিক ধর্ম তাঁকে শান্তি দেয় না। পাশাপাশি পাশ্চাত্য ভোগবাদী সংস্কৃতিতে দাঁর দমবন্ধ হওয়ার উপত্র(ম।

দ্বিতীয় স্তর ঃ- পাশ্চাত্য বস্তুবাদী জীবন থেকে মুক্তি(পেতে তিনি সাধু সন্তদের আশ্রয় হিমালয়ের কোলে চলে আসেন। অবশ্য প্রথমে তিনি দা(ণ্যের কোনো একটি আশ্রমে আশ্রয় গ্রহন করেছিলেন। এই আশ্রম কর্তৃপ('ত্রি(স' এর ভারত ভক্তি(প্রীতি দেখে নতুন নামকরন করেন - শিবখ্রিস্টস্বামী।

তৃতীয় স্তর ঃ- চাকচিক্য জৌলুষ ও শালিশ করা সভ্যতা থেকে নিজেকে, আপন সত্তাকে মুক্ত(দরিদ্র মানুষের সঙ্গে থাকার প্রবল বাসনার কথা ব্যক্ত(করেছেন। ঠিক এই বাসনা থেকে তিনি চারধামের মধ্যে যে কোনো স্থানে জমি কিনে আশ্রম নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন।

চতুর্থ স্তর ঃ- বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে, বৈভব থেকে অ-বৈভবের জগতে নিজেকে দাঁড় করানোর জন্য তিনি ৩০০ ডলার ও ২৫০০ টাকা যথাত্র(মে হৃষিকেশের কোনো এক অপরিচিত ব্যক্তি(এবং লেখিকা ও তার সঙ্গীদের কাছে গচ্ছিত রাখেন।

পঞ্চম স্তর ঃ- চারধামের পৌরানিক মহিমার প্রতি শিবখ্রিস্টাস্বামীর আছে গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি(ও ভালোবাসা। এই শিবখ্রিস্টাস্বামীর সঙ্গে লেখিকার প্রথম পরিচয় হয় গঙ্গোত্রীতে।

ঈশ্বরের ভক্তিতে শিবখ্রিস্টস্বামী এক অসামান্য দার্শনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখিকাকে তিনি বলেন — ''ভগবানের কাছে যাবে, ঠিক যেভাবে তোমার শরীর সহজে যেতে পারবে সেই ভাবেই যাবে... ডান্ডি নাও, কান্ডি নাও।'' এহেন উক্তি লেখিকার এক প্রকান্ড ভুলকে সাবলিল ভাবে ধরিয়ে দেয়। তার কাছে হিমালয় যাত্রী হয়ে ওঠে আরও সহজ।

সুরথ সিং ঃ- ' হে পূর্ণ তব চরনের কাছে' ভ্রমণ সাহিত্যটিতে সুরথ সিং এর যে পরিচয় আমরা পাই সেখান থেকে জানতে পারি তিনি একজন পেশায় ড্রাইভার। লেখিকাদের হিমালয় যাত্রাপথে এই সুরথ সিং তাঁদের ড্রাইভ করেন।

হিমালয় যাত্রাপথে হনুমানচটিতে পৌছানোর পর লেখিকা সুরথ সিংহকে হোটেলের খোঁজে পাঠান। তিনি খোঁজ নিয়ে লেখিকাদের জানান যে কর্তৃপক্ষ পি.ডব্লু.ডি.-র ইঞ্জিনিয়ারের কোয়াটার ভাড়া দেননা। চারধামের যাত্রাপথে সুরথ সিং শুধু লেখিকা ও তার সঙ্গীদের গাড়ির ড্রাইভার নন, একসময় তিনি যেন সমগ্র চারধামের যাত্রাপথের গাইড হয়ে ওঠেন।

গঙ্গোত্রী যাবার সময় ধরাসুর কাছে নেকড়ে বাঘের মতো কুকুর দেখে লেখিকা বিস্ময় প্রকাশ করলে সুরথ সিং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন এই ভাষায়। ঃ ''এই কুকুরগুলিও গাড়োয়ালী নয়, তিব্বতী, মানস সরোবরের ওদিক থেকে তিব্বতীরা নিয়ে আসে বেচতে। খুব সাহসী, খুবই ইমানদার কুত্তা। ৫০০ টাকা দাম বটে। কিন্তু টাকার সম্পত্তি আগলায়। মানুষের চেয়ে ঢের ভালো। মেষপালকের ভগবান।''

ইন্দর সিং - ' হে পূর্ণ তব চরনের কাছে' ভ্রমণ সাহিত্যটি নিরন্তর সন্ধানরত জীবনদর্শন কথন এই জীবন দর্শন এক প্রান্ত ধরে আছে শ্রষ্টার একান্ত নিজস্ব আধ্যাত্মিক চেতনা অন্যদিকে আছে বনজীবনের লোকায়ত মানুষ সে প্রতিটি মানুষ সত্রিয়তায় উজ্জ্বল। কুন্দন সিং, ইন্দর সিং সেইরকমই দুজন মানুষ যাদের সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাৎ হয়েছে উত্তরাখন্ডে ভ্রমণকালে। চরিত্রটির চারিত্রিক নানাদিক সংরূপে ছকে দেখানো হল ইন্দর সিং- বৃদ্ধ, যত্নপরায়নতা। ইন্দর সিং এর সাথে লেখিকাদের প্রথম দেখা হয় ভাটওয়াড়ির পর গাঙ্গনানীর কিছু আগে একটি চায়ের দোকানে। এই চায়ের দোকানটি ছিল বৃদ্দ গাড়োয়ালা ইন্দর সিং এর। ইন্দর সিং এর ছোট্টো খাট্টো ফোকলা দাঁত, ছানি পড়া চোখ, কুলুর টুপি মাথায় দেওয়া।

ইন্দর সিং বৃদ্ধ গরিব হওয়া সত্ত্বেও তার ভিতরে সৌজন্যে বোধের কোনো অভাব নেই। তিনি লেখিকা ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে চায়ের দাম হিসাবে পঞ্চাশ পয়সা নেন, অন্যদের থেকে যা দশ পয়সা কম। ' হে পূর্ণ তব চরনের কাছে' গ্রন্থটি অনেক চরিত্রের সমাবেশে হয় উঠেছে 'চরিত্রের চিত্রশালা'। এ হেন গ্রন্থে ইন্দর সিং পাঠককে পরিপূর্ণ রসের তীর্থে উপনীত করে।